গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ - ১৭ যুগ্ম সংখ্যা-৩, ৪ মে - অগস্ট ২০২০ RNI : WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৩০ টাকা

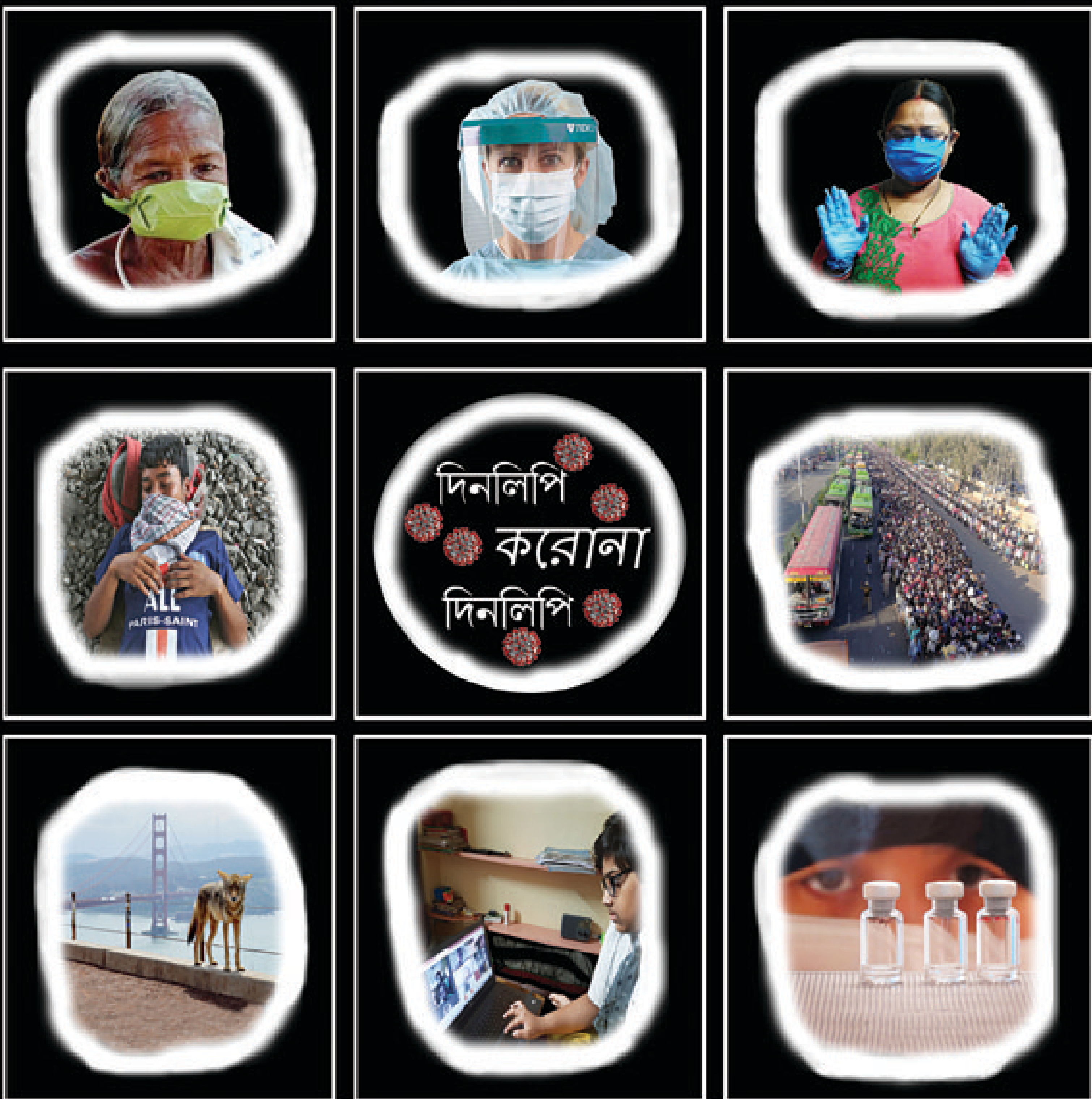

সূচি

১ আমাদের কথা

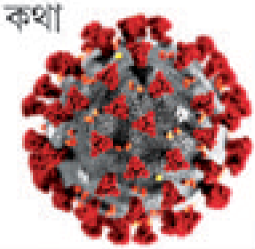

২ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
কোভিড ১৯ : গবেষনার আলোকে

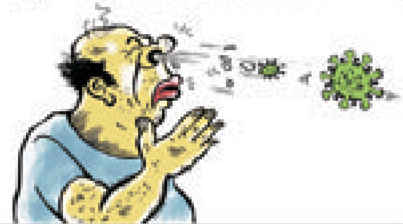

১৭ করোনা সংক্রমনের সাংখ্যচিত্র

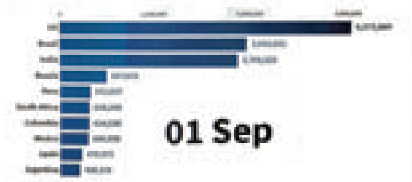

১৮ সুকল্যান গাইন
মহামারী অতিমারী বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

২৪ নন্দগোপাল পাত্র
পরিবেশ শিক্ষক : কোভিড ২০১৯

৩০ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
কিছুই আর আগের মত রইল না

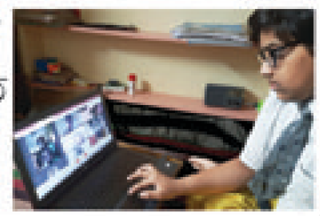

৩২ পান্নালাল মানি
কঠিন পরিস্থিতি ও মানসিক স্বাস্থ্য

৩৪ ডা: শ ঙ্কর কুমার নাথ
ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও তার স্বাস্থ্যবিধির তত্ত্ব

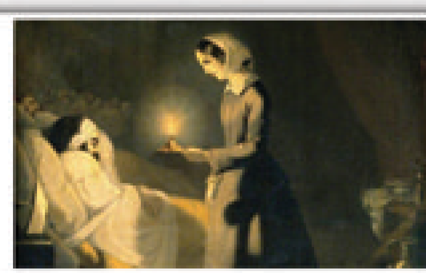

৩৬ ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু
করোনা কুসংস্কার— গোমূত্র, ৩৩ কোটি দেবতা ইত্যাদি

৪২
সন্দীপ সাহার আলোকচিত্র করোনার কোলকাতা

৪৪ কবিতা
কল্যাণ মিত্র
জগন্ময় মজুমদার
নির্মাল্য দাশগুপ্ত
শ্যামলকান্তি মজুমদার
ছন্দা শীল কর্মকার
মন্দিরা ঘোষ

৪৬ অনুপ হালদার
লকডাউনে কেমন আছে নদীয়া

৪৮ মানচিত্রে করোনা বিস্তৃতি

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সর্দার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
1.bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :
9143264159 (Anup Haldar)

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা

তাপস মজুমদার

অঙ্কন

সৌরভ মুখার্জী

আমাদের কথা : করোনার দিনলিপি

আজ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে করোনা আক্রান্ত ৩,১১,২২,১৮২
আজ পর্যন্ত ভারতে করোনা আক্রান্ত ৫৪,৪৯,৯০২
আজ পর্যন্ত বাংলায় করোনা আক্রান্ত ২,২৫,১৩৭

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে করোনায় মৃত্যু ৯,৬৩,৩৬৩
আজ পর্যন্ত ভারতে করোনায় মৃত্যু ৮৭,৩১২
আজ পর্যন্ত বাংলায় করোনায় মৃত্যু ৪,৩৫৯

এর মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ ধ্বনি
এর মধ্যে উৎসব ধর্ম নির্মাণ
উল্লাস আই-পি-এল এর বিদেশ ভ্রমণ

এর মধ্যে আসরে
হাসপাতাল ব্যবসায়ী
লুঠপাট লুঠপাট
এর মধ্যে আর্তনাদ—'ধরার কোন লোক নেই। কে ধরবে?'
এর মধ্যে করোনা মুক্তির অব্যর্থ দাওয়াই,
মূত্র বিষ্ঠা ঘন্টা
কুসংস্কারের পাপড় ভাজা
এর মধ্যে এক জানা সুশান্ত, অনেক অজানা সুশান্তের মৃত্যু
অবসাদ অবসাদ

এর মধ্যে কত কি করার ছিল, করা হল না
দেবদত্তা শ্যামল ও প্রদীপদের

যদিও ব্যর্থ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
যদিও ব্যর্থ যত দেশের সরকারেরা
যদিও ব্যর্থতার গতিপথ হার্ড ইমিউনিটির দিকেই

তবু আশায় আশায়
'ঐ দেখা যায় রশ্মি ভ্যাকসিন'
তবু অন্ধকারে আলোক শিখা, ফিনিক্স পাখির জেগে ওঠা
আমাদের 'তারা'রা
আমাদর করোনা যোদ্ধা
ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, বিজ্ঞানী ও পুলিসেরা
মানবিক সনু সুদেরা

তাই আরেকবার রবীন্দ্রনাথকে
আরেকবার ধুলো ঝেড়ে সুভাষিতম্‌
'তরীখানা বাইতে গেলে, মাঝে মাঝে তুফান মেলে।
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি করব না।'

—তাপস মজুমদার

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

করোনা ভাইরাস ও কোভিড-১৯ : গবেষণার আলোকে

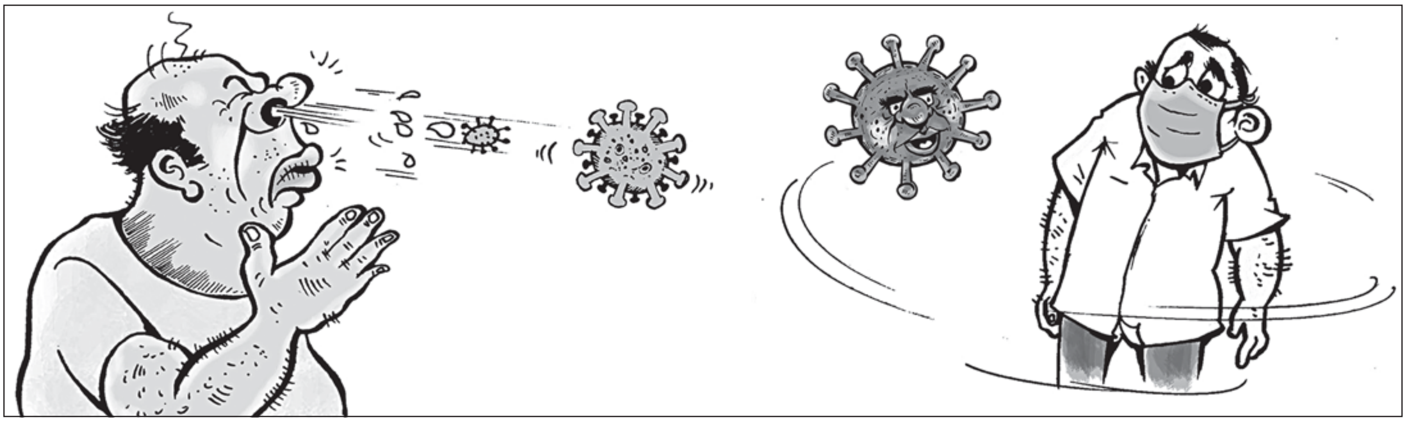

ভাবুন ভাইরাস নামক ন্যানোমিটার[১] সাইজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কণিকা নিজেকে বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ও বুদ্ধিধর ভাবতে থাকা মানুষ নামক জীবটির দাম্ভিকতার বেলুন কীভাবে চুপসে দিয়েছে!

মানুষ এখন করোনা ভাইরাসকে পরাজিত করার স্বপ্ন ছেড়ে তার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। নভেল করোনা তথা কোভিড-১৯ রোগটি আজ মানুষকে তার পুরনো বহু অভ্যাস বদল করতে শেখাচ্ছে; উপরন্তু নতুন কিছু অভ্যাসে অভ্যস্ত করতেও বাধ্য করছে। মানুষের মত সামাজিক জীব এখন সমস্তরকম সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান জলাঞ্জলি দিয়ে সাবান-জলে হাত ধুয়ে, মুখে 'মাস্ক' পরে 'সামাজিক দূরত্ব' রক্ষা করছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র এখন সবই ভার্চুয়াল-যন্ত্রনির্ভর। 'অভ্যাসের দাস' মানুষের কী নির্মম পরিণতি।

করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি

এখন পর্যন্ত জানা তথ্য অনুযায়ী, নভেল করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে বাদুড় থেকে। বাদুড়ের করোনা ভাইরাস জিন পরিবর্তনের

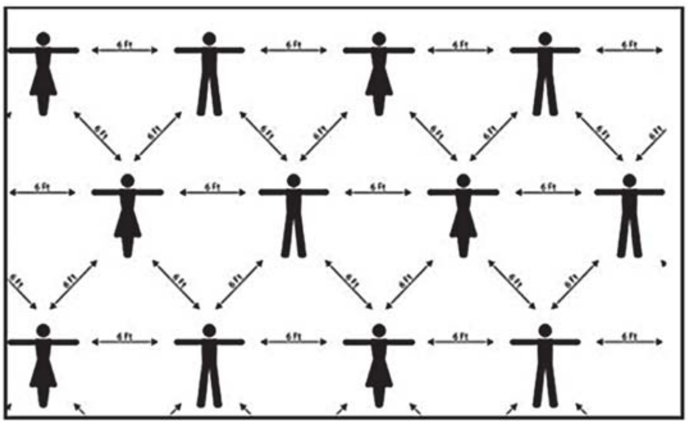

মধ্যে দিয়ে প্যাঙ্গোলিন নামক প্রাণীতে যায় ও পরবর্তীতে তা মানুষের শরীরে আসে। জিন পরিবর্তিত এই ভাইরাস বর্তমানে অবশ্য মানুষে মানুষে সংক্রামিত হচ্ছে।

এভাবে প্রাণী থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়া রোগকে 'জুনোটিক' রোগ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, মানুষে যত সংক্রামক রোগ দেখা দিচ্ছে, তার প্রায় ৭৫ শতাংশ রোগের উৎপত্তিই প্রাণীর দেহে; জুনোটিক। বলাই বাহুল্য, এর বেশির ভাগটাই বণ্যপ্রাণী ও পাখির দেহজাত।

'পৃথিবীটা কি শুধু মানুষের জন্য?' প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রয়াত জনবিজ্ঞানী অধ্যাপক তারক মোহন দাস তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থে। আমরা তখন পৃথিবীর বিপুল জীববৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। বুঝেছি আমাদের এই পৃথিবীতে রয়েছে ক্ষুদ্র শৈবাল থেকে পূর্ণবয়স্ক বৃহদাকার অশ্বত্থ গাছ; অ্যামিবা থেকে বৃহদাকার পাইথন। ধরিত্রীর এই জীবজগৎ কী বিপুল বৈচিত্র্যে ভরপুর; কী নৈসর্গিক তার উপস্থিতি। আরও তলিয়ে ভাবলে, আণুবীক্ষণিক জীবের উপস্থিতি এর ব্যাপকতাকে কত সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আপাতঃ অদৃশ্য হলেও ক্ষুদ্র জীবাণুকূল যে এই ধরিত্রীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা আমরা আজকের দিনে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি।

লোভ আর স্বার্থপরতার রিপুতে অন্ধ মানুষ বণ্যপ্রাণকেও নিস্তার দেয়নি। তাইতো বণ্যপ্রাণের (পড়ুন বাদুড়) থেকে 'স্পীলওভার' হওয়া ভাইরাস এখন সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির কাছে ত্রাস তৈরি করতে পারল।

করোনা ভাইরাসের পরিচিতি

আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে রাখি, আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। কী, বিশ্বাস হল না তো? তা হলে শুনুন, সর্দি-জ্বর সৃষ্টিকারী চার ধরনের (পরিভাষায় স্ট্রেনের) করোনা ভাইরাস (২২৯ ই, এন এল ৬৩, ও সি ৪৩, এইচ কে ইউ ১) আমাদের চারপাশের পরিবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এরা মারাত্মক বা প্রাণঘাতী নয় বলে হাঁচি, কাশি, সর্দি-জ্বরের মত সাধারণ উপশম নিয়ে পাঁচ/ছয় দিন ভুগিয়ে চুপচাপ চলে যায়। জেনে আশ্বস্ত হবেন, শুধু মানুষেরই নয়, কুকুর, বিড়াল, গবাদি প্রাণী, শূকর, মুরগি, ইঁদুর সকলেই করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তারা নির্দিষ্ট রোগের শিকার হয়। যেমন করোনা ভাইরাস কুকুরে এন্টেরাইটিস, বিড়ালে পেরিটোনাইটিস, গরু ও শূকরে গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, মুরগিতে ব্রঙ্কাইটিস ও ইঁদুরে হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। অর্থাৎ প্রাণীদেহে এরা সর্দি-জ্বর না করে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ আক্রমণ করে এবং নির্দিষ্ট উপসর্গ তৈরি করে। এমনকি কম ভয়াবহ হলেও এরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন— মুরগির ব্রঙ্কাইটিস-এ মৃত্যুহার প্রায় ৩০ শতাংশ। তবে মহামারীতে ৭৫ শতাংশও হতে দেখা গেছে। এখন মনে মনে নিশ্চয়ই বলছেন, আরে এটা 'নভেল' করোনা, মারাত্মক ছোঁয়াচে, সার্স (সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) ও মার্স (মিডিল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) ধরনের। তাইতো এত হৈ চৈ।

কথাটা একদম ঠিক। এটি একটা নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস, যা সার্স বা মার্স সৃষ্টিকারী ভাইরাস-এর মতই প্রাণীদের দেহ থেকে জিন পরিবর্তন (জেনেটিক মিউটেশন)[2] করে মানুষকে আক্রান্ত করার ক্ষমতা লাভ করেছে। অর্থাৎ প্রজাতির বাধা অতিক্রম করে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষে চলে এসেছে। তাহলে এখন প্রশ্ন, কী এই প্রজাতি বাধা? এককথায় করোনা ভাইরাস বা অন্যান্য সমস্ত ভাইরাস-ই নির্দিষ্ট প্রাণীকূলকে আক্রমণে পারদর্শী। সবাইকে নয়। তার কারণ ভাইরাস প্রাণীদেহে ঢুকতে গেলে, তাকে শরীরের যেকোনও কোষে আশ্রয় নিতে হয়। আর তাই তার প্রয়োজন কোষে ঢুকতে পারার 'পারমিট'। সেটা হল, কোষের বাইরে ডিশ অ্যান্টেনার মত বেরিয়ে থাকা কিছু গ্রাহক (রিসেপ্টর)[3]-এর উপস্থিতি। ভাইরাসের গায়ে বেরিয়ে থাকে পেরেকের মত কিছু জীবাংশ (লিগাণ্ড)[4] যা কিনা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম। অর্থাৎ লিগাণ্ড যখন তার উপযোগী গ্রাহকের সংস্পর্শে আসে তখন তার সাথে যুক্ত হয় ও গ্রাহক সহযোগে কোষে ঢোকে। বোঝাই যাচ্ছে, যেকোনও ভাইরাস যেকোনও কোষে ঢুকতে পারবে না, যদি না তার কাছে রিসেপ্টর উপযোগী লিগাণ্ড থাকে। তাই ভাইরাসের কোষ আক্রমণের ক্ষমতা সাধারণভাবে সীমিত। এজন্য কোনও ভাইরাস শ্বাসনালী, কোনও ভাইরাস খাদ্যনালী, আবার কোনও ভাইরাস যকৃৎ, বৃক্ক, পাকস্থলী বা স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য ভাইরাস একাধিক অঙ্গ আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে। গ্রাহকের উপস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণীকোষকে আক্রমণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন ভাইরাসের বিভিন্ন বলেই তারা নির্দিষ্ট প্রাণীকেই আক্রমণ করে। এটিকে আমরা বলি 'স্পিসিস বেরিয়ার' (প্রজাতিগত বাধা)।

মুশকিল হচ্ছে, জিনের পরিবর্তন করে ভাইরাস তার খোলকের বাইরে বেরিয়ে থাকা পেরেকের (লিগাণ্ডের) গড়ন বদলে ফেলে। আর তাই পরিচিত গণ্ডীর বাইরের গ্রাহক (রিসেপ্টর)-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনের পরিণতি হতে পারে মারাত্মক। ভাইরাস তখন নির্দিষ্ট প্রাণীর নির্দিষ্ট কোষ ছেড়ে অন্য কোষকে আক্রমণে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। যেমনটা দেখা গেছিল ২০০২ সালে সার্স করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে। এই ভাইরাস বাদুড়ের কোষ ছেড়ে মানুষের শ্বাসনালীর কোষে যুক্ত হবার ক্ষমতা পেয়েছিল। ২০১২ সালে মার্স-করোনার ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিল, যখন এই ভাইরাস উটের শ্বাসনালীর কোষ ছেড়ে মানুষের কোষকে আক্রমণে সক্ষম হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিকেই প্রজাতিগত বাধা অতিক্রম বলে। এই সময়ে এই ভাইরাস ভয়ানক মারণক্ষম ও ছোঁয়াচে প্রকৃতির হয়।

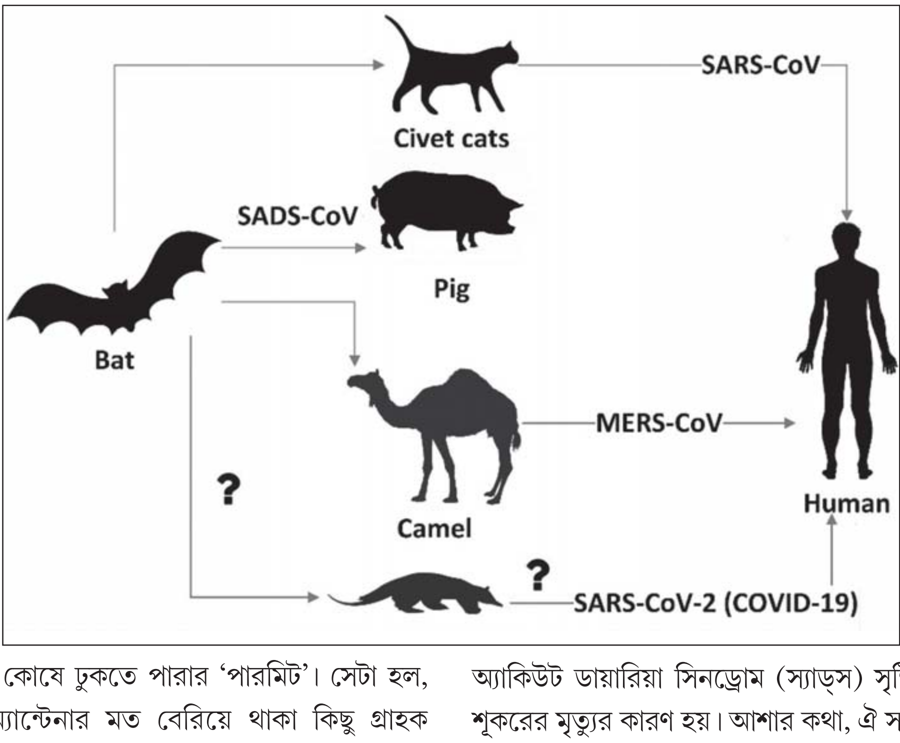

সার্স করোনা ভাইরাস বিশ্বের ৩৭টি দেশের ৮০০০ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ও ৭৭৪ জনের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। আবার মার্স করোনা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ২০০০ মানুষকে আক্রান্ত করে। ৮৫৮ জন এতে মারা যান। ২০১৬ সালে দক্ষিণ চিনে এরকমই বাদুড়ের করোনা ভাইরাস শূকরে ছড়িয়ে পড়ে ও সোয়াইন অ্যাকিউট ডায়ারিয়া সিনড্রোম (স্যাড্‌স) সৃষ্টি করে। এটি ২৪ হাজার শূকরের মৃত্যুর কারণ হয়। আশার কথা, ঐ সময়ে এই করোনা ভাইরাস মানুষে ছড়িয়ে পড়েনি। আশঙ্কার কথা, কিছু বণ্যপ্রাণীতে করোনা

ভাইরাস রোগ সৃষ্টি না করে শরীরে থেকে যায়। যেমন— সুস্থ বাদুড়, রেকুন-কুকুর বা সি-ভেট বিড়াল-এর দেহে করোনা ভাইরাস বছরের পর বছর থেকে যায়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাদুড়ের করোনা ভাইরাস মানুষে ছড়িয়ে পড়তে গেলে সেই ভাইরাসকে রেকুন-কুকুর, ভাম-প্রজাতির সি-ভেট বিড়াল জাতীয় প্রাণীতে বাসা বাঁধতে পারার ক্ষমতা রপ্ত করতে হবে। তবেই সে জিন পরিবর্তন করে আরও মারাত্মক হয়ে মানুষকে আক্রমণ করতে পারবে। যেমনটা দেখা গেছিল মার্স করোনার ক্ষেত্রে। অবশ্য মার্স করোনা মানুষে চলে আসে সরাসরি উটের দেহ থেকে।

করোনা ভাইরাসের গঠন

করোনা ভাইরাসের সামগ্রিক গঠন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে পুরো বিষয়টা স্পষ্ট হবে না। করোনা ভাইরাস করোনাভিরিডি পরিবারের

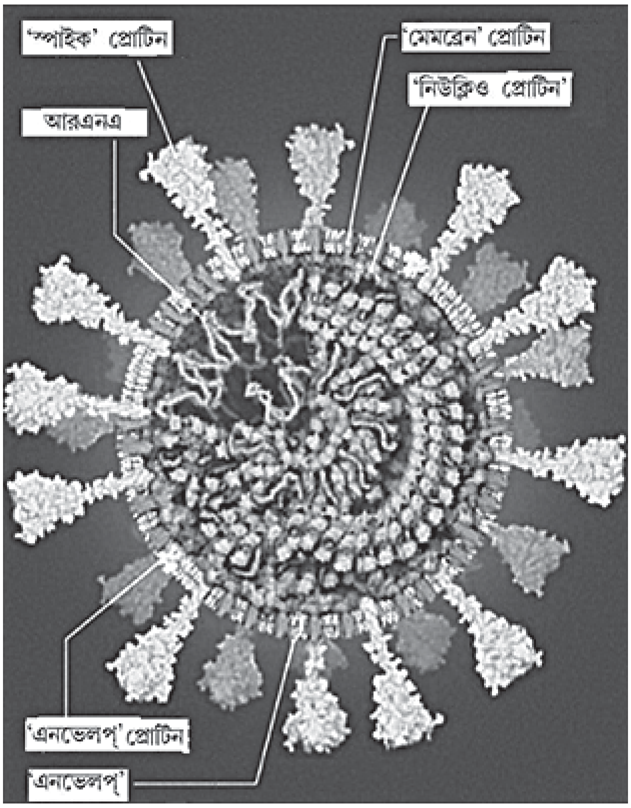

সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের আনবিক গঠন

একটি আরএনএ ভাইরাস। এটি গড়ে ১২০ ন্যানোমিটার সাইজের, ঘনকাকার আকৃতির। স্নেহ-জাতীয় পদার্থের চাদরে ঢাকা প্রোটিনের খোলক ও রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড (আরএনএ)-এর একটি খণ্ড দিয়ে এর শরীর তৈরি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এই ভাইরাসকে মুকুটের মত দেখতে হওয়ায় এর নাম করোনা (ল্যাটিনে 'করোনা' শব্দের অর্থ ক্রাউন বা মুকুট)। চারটি প্রোটিন এই ভাইরাসের গঠনের মুখ্য উপাদান। প্রোটিন খোলকের বাইরে পেরেকের মত প্রত্যঙ্গ 'স্পাইক' প্রোটিন দিয়ে তৈরি। বাইরের চাদরে রয়েছে 'এনভেলপ্' প্রোটিন। খোলকের পর্দায় রয়েছে 'মেমব্রেন' প্রোটিন এবং আরএনএ-কে জড়িয়ে রয়েছে 'নিউক্লিও প্রোটিন'। স্পাইক প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড সজ্জাই গ্রাহকের সঙ্গে বন্ধনী তৈরিতে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, সার্স করোনা ভাইরাস-এর স্পাইক প্রোটিন 'অ্যানজিনোটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম' ও মার্স করোনা ভাইরাসের স্পাইট প্রোটিন 'ডাইপেপটিডাইল পেপটিডেজ' গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয়। নতুন এই করোনা ভাইরাসের গ্রাহকের প্রকৃতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

স্পাইক প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জার পরিবর্তন সম্ভব আরএনএ-তে অবস্থিত জিনসজ্জার 'মিউটেশন' (পরিব্যক্তি)-এর মাধ্যমে। এই পরিবর্তন একেবারেই আকস্মিক অর্থাৎ অতর্কিতে হঠাৎ হওয়া (অ্যাক্সিডেন্টাল)। অবশ্যই পরিবেশ জনিত কারণে। বর্তমানের এই নভেল করোনাও অতর্কিতে হওয়া মিউটেশনের এক মারাত্মক ফলশ্রুতি। তবে কোন্ কোন্ প্রাণীর শরীর পেরিয়ে মানুষে এসেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গবেষণা চলছে। এখন এই করোনা ভাইরাস যে মানুষ

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস ও ফুসফুস কোষের সংযোগস্থাপন

থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে, তা জানা গেছে। আর তাই বিজ্ঞানীমহল এত চিন্তিত।

মারাত্মক ছোঁয়াচে ও মারণক্ষম ভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় ও নিশ্চিত ডায়াগ্নসিসের জন্য 'বায়োসেফটি লেভেল ফোর' স্তরের বীক্ষণাগার[৫] প্রয়োজন, যা আমাদের এই বিশাল দেশে এখন অপ্রতুল।

ভাইরাসের চলন

সমস্ত ভাইরাসের মতই করোনা ভাইরাসেরও জৈব জীবনের জন্য প্রয়োজন একটি কোষের। আর কোষের ভেতরে প্রবেশের জন্য দরকার কোষের বাইরে বেরিয়ে থাকা একটি রিসেপ্টর বা গ্রাহক।

তবে যেকোনও গ্রাহক হলে চলবে না। ভাইরাসের দেহের বাইরে বেরিয়ে থাকা প্রত্যঙ্গ (পরিভাষায় লিগাণ্ড)-এর সঙ্গে এই গ্রাহকের সাজুয্য (কমপ্যাটিবিলিটি) থাকতে হবে। অর্থাৎ কোষের রিসেপ্টরটি যদি দরজার তালা হয়, ভাইরাসের লিগাণ্ডটি সেক্ষেত্রে চাবি। বোঝাই যাচ্ছে, প্রত্যেক ভাইরাসের পক্ষে তার নিজস্ব চাবি দিয়ে তালা খোলা তখনই সম্ভব, যখন তার চাবির সঙ্গে সেটা মানানসই হয়। এজন্য যে সমস্ত কোষে মানানসই রিসেপ্টর উপস্থিত, সে সমস্ত কোষেই কেবলমাত্র ভাইরাস ঢুকতে পারে।

সার্স-কোভ-১ ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন লিগাণ্ডের সঙ্গে কোষের রিসেপ্টর হিসাবে কাজ করে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম-২ (এসিই-২)। আর পাশে থেকে তার কাজকে ত্বরান্বিত করে একটি কোষীয় সেরিন প্রোটিয়েজ উৎসেচক, যার পোষাকি নাম 'টিএমপিআর এসএস ২' (ট্রান্স মেমব্রেন প্রোটিয়েজ-২)। ঠিক যেমন সামান্য তেল দিলে চাবি দিয়ে তালাকে খুলতে সুবিধা হয়, অনেকটা সেইরকম।

স্পাইক প্রোটিনের গ্রাহকগুলো ফুসফুসের টাইপ-২ অ্যালভিওলার কোষ ছাড়াও রক্তকোষ (মনোসাইট, ম্যাক্রোফাজ ও ডেনড্রাইটিক কোষ) এবং হৃদযন্ত্র, বৃক্ক ও পৌষ্টিকতন্ত্রের কোষেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্যে রয়েছে লিগাণ্ড ও রিসেপ্টরের নিবিড় বন্ধনী। করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন এসিই-২ এর সঙ্গে ভীষণ নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হয় বলে সার্স-কোভ-২ ভাইরাস এতটা ছোঁয়াচে, এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম।

শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস সৃষ্ট রোগ (কোভিড-১৯)-কে আমরা কয়েকটি শারীরবৃত্তীয় কবিতার আঙ্গিকে পর্যালোচনা করতে পারি। যেমন— প্রত্যক্ষ ভাইরাস-সৃষ্ট বিষক্রিয়া, অঙ্গের এণ্ডোথেলিয়াল কোষস্তরের[৬] বিনাশ, প্রদাহজনিত রক্ত জমাট বাধার সমস্যা, রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনার অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ এবং রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন-অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম-এর কার্যহীনতা।

প্রত্যক্ষ ভাইরাস-সৃষ্ট বিষক্রিয়া

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস এসিই-২ রিসেপ্টরের সাহায্যে শ্বাসনালীর এপিথেলিয়াল কোষ,[৭] বিশেষতঃ ফুসফুসের অ্যালভিওলার কোষ (টাইপ-২)-কে আক্রমণ করে। এছাড়া এই রিসেপ্টরের উপস্থিতির জন্য হৃদপিন্ডের, বৃক্কের, অন্ত্রের ও স্নায়ুতন্ত্রের কোষগুলোও এই ভাইরাসের টার্গেট। এসিই-২ ও টিএমপিআরএসস-২-এর যৌথ উপস্থিতি শরীরের বিভিন্ন কোষ, যেমন— নাকের গবলেট সিক্রেটরী কোষ, কোলানজিওসাইট, কোলোনোসাইট, গ্রাসনালীর কেরাটিনোসাইট, অন্ত্রের এপিথেলিয়াল কোষ, অগ্নাশয়ের বিটা-কোষ ও রেনাল প্রক্সিম্যাল টিবিউল্স কোষকে এই ভাইরাস সংক্রমণের উপযোগী করে তুলেছে।

এণ্ডোথেলিয়াল কোষস্তরের বিনাশ ও প্রদাহজনিত রক্ত জমাট বাধা ঃ ধমনী ও শিরার মত রক্তবাহনালীর এণ্ডোথেলিয়াল কোষের গায়ে সার্স-কোভ-২ এর রিসেপ্টর এসিই-২ প্রচুর পরিমানে মজুত থাকে। ফুসফুস, বৃক্ক, হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও অন্ত্রের রক্তবাহনালীর এণ্ডোথেলিয়াল স্তর করোনা ভাইরাসের আঘাতে নষ্ট হয়, তৈরি হয় প্রচুর পরিমানে থ্রমবিন প্রোটিন। সাথে ঘটে রক্তের কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনের আধিক্য। এই সমস্তই অনুচক্রিকা (প্লেটলেট্স) বেষ্টিত ছোট ছোট রক্তের ক্লট তৈরি করতে সাহায্য করে। ভাইরাস সংক্রামিত প্লেটলেট্স ও নিউট্রোফিলের যৌথ কার্যকলাপে এণ্ডোথেলিয়াম ধ্বংসের সাথে সাথে নানা ধরনের সাইটোকাইন জৈব-অণুর বৃদ্ধি ঘটে। পরিণতিতে ফুসফুসের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে। ফুসফুসের বাইরের আচ্ছাদিত কোষ ধ্বংসের কারণে ফাটল তৈরি হয়। একদিকে রক্ত জমাট বাধার ফলে 'ব্লাড ক্লট' তৈরি হওয়া এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিমান কমে যাওয়া (পরিভাষায় হাইপক্সিয়া হওয়া); অন্যদিকে রক্তের জলীয় অংশ ফুসফুসের ফাটল দিয়ে আচ্ছাদন ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করা পরিস্থিতিকে জটিল ও প্রতিকূল করে তোলে।

রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণহীনতা

রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই থাকে টি-লিম্ফোসাইটের হাতে। উপযুক্ত সাইটোকাইন[৮] নিঃসরণের মাধ্যমে কোষীয় সংযোগ

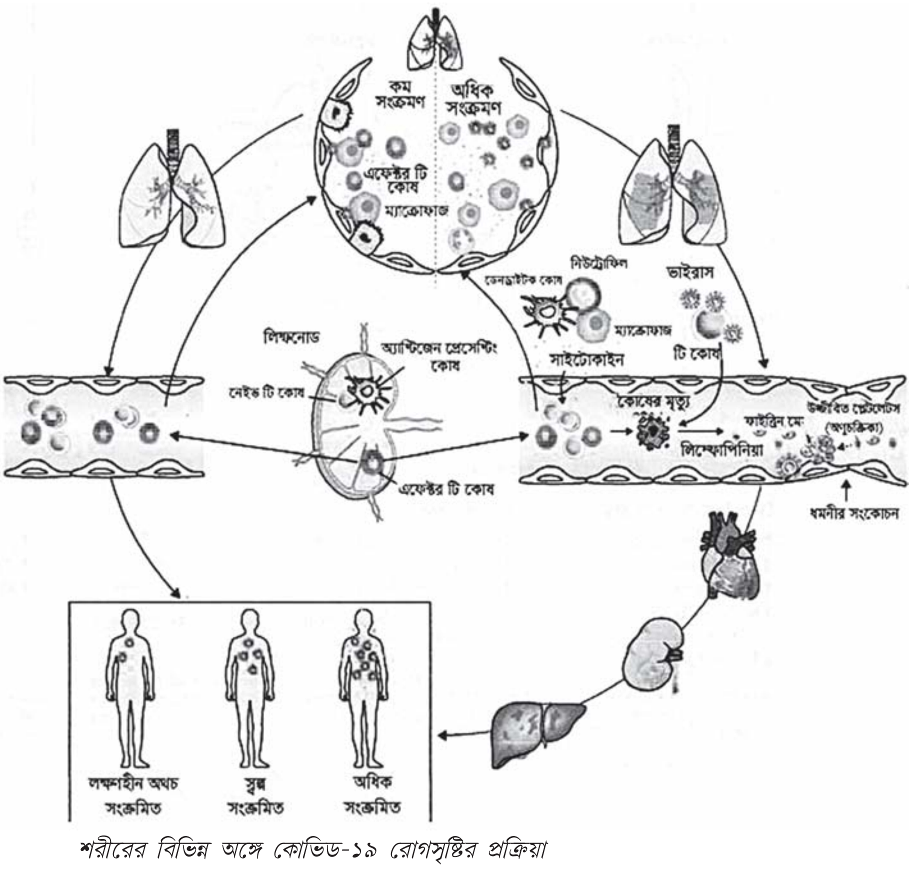

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কোভিড-১৯ রোগসৃষ্টির প্রক্রিয়া

রক্ষা ও তাদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের কার্যকলাপে (আক্রমণে) টি-লিম্ফোসাইটের মৃত্যু তথা রক্তে তাদের সংখ্যা হ্রাস তাই প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সূচক বলা যেতে পারে। ভাইরাসের আক্রমণে ইন্টারফেরন সিগন্যালিং ব্যাহত হয়। নিউট্রোফিল, মোনোসাইট ও অন্যান্য কোষের ক্রিয়াকলাপ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় শুরু হয় প্রদাহ (ইনফ্লামেশন)। এই সময়ে রক্তে সি-রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, ফাইব্রিনোজেন, ফেরিটিন, ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক অত্যধিক বেড়ে যায়। সাইটোকাইনগুলোর মধ্যে ইন্টারলিউকিন-৬ সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়, যা চরম পরিণতির জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী।

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯-এ রোগের মৃদু প্রভাব পড়া ও আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব হয় ফুসফুসের ম্যাক্রোফাজ সৃষ্ট প্রদাহী কার্যকলাপের সূত্র ধরে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শরীরের সহজাত ও অধিক প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনা ভাইরাস নির্মূলনে কাজ করে। এক্ষেত্রে ম্যাক্রোফাজ ও নিউট্রোফিল-এর মত ফ্যাগোসাইটিক কোষ এবং ন্যাচারাল কিলারকোষ ও সাইটোটক্সিক লিম্ফোসাইটের মত ভাইরাস আক্রান্ত কোষ-ধ্বংসকারী সৈন্যকোষরা ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

কিন্তু দেখা গেছে, জটিল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি হওয়া; পরিণতিতে 'অ্যাকুট রেসপিরেটরি সিনড্রোম'[৯] এবং শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু কোষীয় প্রদাহ ও দেহের প্রতিরোধী কোষ (ইমিউন সেল)-এর অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফলশ্রুতি।

করোনা ভাইরাস কোষীয় রিসেপ্টরকে কাজে লাগিয়ে এবং ফুসফুস সংলগ্ন লিম্ফনোড ও ইমিউন রক্তকোষ (মনোসাইট, ম্যাক্রোফাজ ও ডেনড্রাইটিক কোষ)-কে আক্রমণ করে এবং তাদের উদ্দীপিত করে। ফলে প্রচুর পরিমানে সাইটোকাইন নামক একপ্রকার প্রোটিন জৈব-অণু নিঃসৃত হয়। প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাইটোকাইনগুলোর মধ্যে ইন্টারলিউকিন-৬, ইন্টারলিউকিন-১বি, ইন্টারফেরন গামা ইনডিউস্‌ড্ প্রোটিন-১০, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর-আলফা ও বিভিন্ন কেমোকাইন অন্যতম। তবে এই সমস্ত সাইটোকাইনগুলোর মধ্যে ইন্টারলিউকিন-৬ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারলিউকিন-৬ দুটি পদ্ধতিতে কোষীয় বার্তা বহনকে ত্বরান্বিত করে, এরা হল **'ক্লাসিক সিস' ও 'ট্রান্স পদ্ধতি'**।[১০] ক্লাসিক সিস পদ্ধতিতে ইন্টারলিউকিন-৬, ইমিউন কোষ-পর্দায় গেঁথে থাকা গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং গ্লাইপ্রোটিন-১৩০-এর সাথে যুক্ত হয়ে কোষীয় বার্তাবহনে ইন্ধন জোগায়। এর ফলে লিম্ফোসাইটের বিভাজন ও বহুবিধ চারিত্রিক পরিবর্তন হয়, যা 'সাইটোকাইন রিলিজ সিড্রোম'[১১]-কে সূচিত করে।

অন্যদিকে ট্রান্স পদ্ধতিতে প্লাজমায় দ্রবীভূত গ্রাহকের সঙ্গে ইন্টারলিউকিন-৬ যুক্ত হয়ে তা রক্তবাহনালীর এণ্ডোথেলিয়াল কোষের পর্দায় গেঁথে থাকা গ্লাইকোপ্রোটিন-১৩০ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কোষীয় সংবেদন পরিবহন ইন্টারলিউকিন-৬ নিঃসরণকে উৎসাহিত করে। ফলে রক্তে ইন্টারলিউকিন-৬ এর পরিমান বহুগুণ বেড়ে যায়। রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাইটোকাইনের উপস্থিতি সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। পরিভাষায়, এর নাম 'সাইটোকাইন ঝড়'।

ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, হৃদযন্ত্রের রক্তবাহনালীর ওপর সাইটোকাইন ঝড়ের প্রভাব অভাবনীয়। ফুসফুসের এপিথেলিয়াল আচ্ছাদন ও পার্শ্ববর্তী রক্তবাহনালীর এণ্ডোথেলিয়াল আচ্ছাদনের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। ক্যাপিলারি এণ্ডোথেলিয়াম নষ্ট হওয়ার ফলে রক্তের তরল অংশ (প্লাজমা) তার উপাদানসহ অ্যালভিওলার ক্যাভিটিতে ঢুকে পড়ে। এর ফলে তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

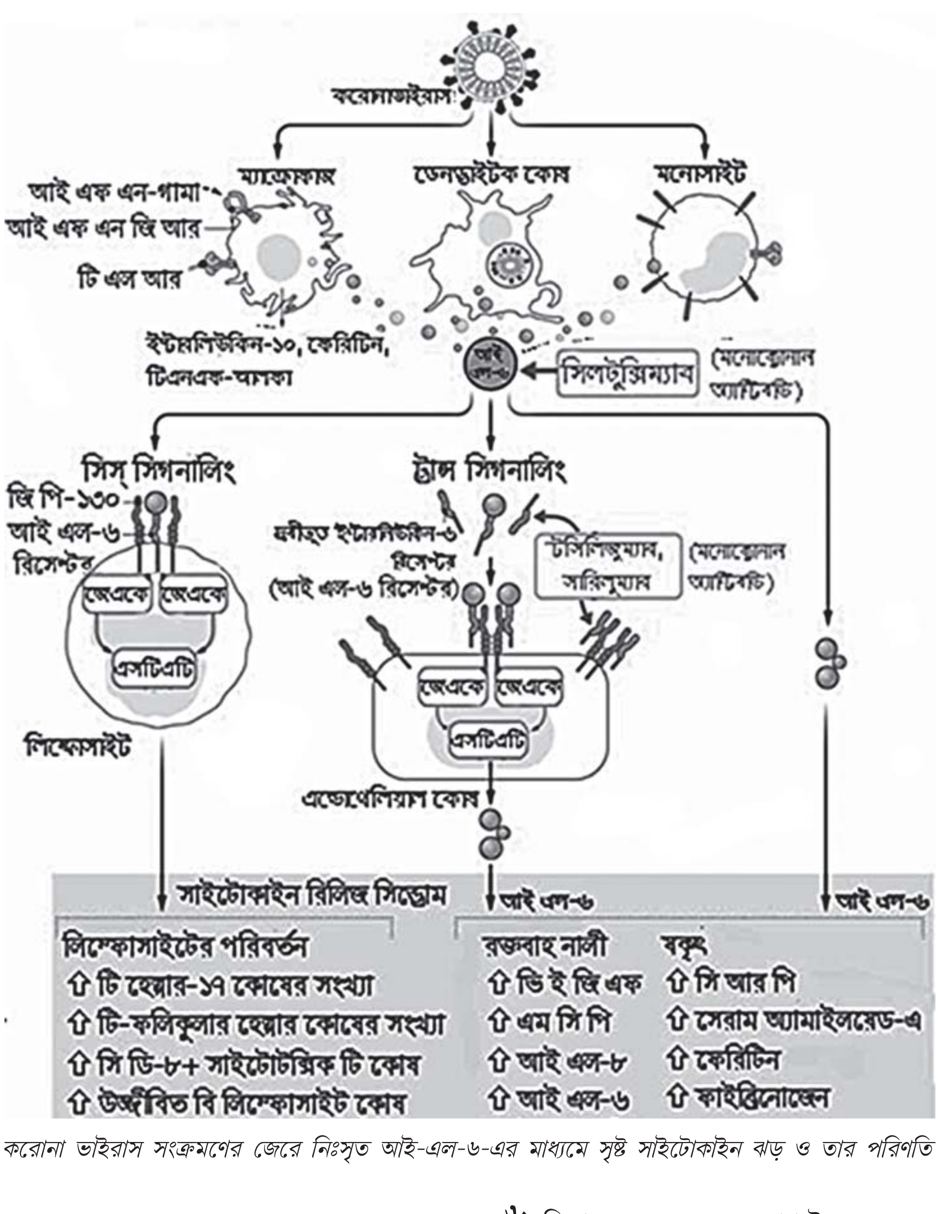

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জেরে নিঃসৃত আই-এল-৬-এর মাধ্যমে সৃষ্ট সাইটোকাইন ঝড় ও তার পরিণতি

এদিকে হৃদযন্ত্র, বৃক্ক, যকৃৎ-এর মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে ফুটো তৈরি হওয়ায় ঐ সমস্ত অঙ্গে অক্সিজেন ও খাদ্যের অভাবে কোষ-মৃত্যু (নেক্রোসিস)[১২] শুরু হয়। এরই অন্তিম পরিণতি 'মাল্টি অর্গান ফেলিওর' ও মৃত্যু, পরিভাষায় যা, 'ভাইরাল সেপসিস' বলে পরিচিত।

রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন-অ্যালডোস্টেরন ('রাস') সিস্টেম-এর কার্যহীনতা ঃ শরীরের জলীয় অংশ, ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য, রক্তচাপ, রক্তবাহনালীর ভেদ্যতা এবং টিস্যু বা কোষ-কলার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে 'রাস-সিস্টেম'। এসিই-২ এই রাস-সিস্টেম-এর বিপরীতধর্মী কাজে লিপ্ত থাকে। এসিই-২ অ্যানজিওটেনসিন-I-কে নিষ্ক্রিয় অ্যানজিওটিনসিন (১ থেকে ৯ প্রকারের)-এ পরিণত করে। অন্যদিকে, অ্যানজিওটেনসিন-II-কে সক্রিয় অ্যানজিওটেনসিন (১ থেকে ৭ প্রকারের) তৈরি করে, যা রক্তবাহনালী প্রসারণ এবং কোষ বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে। তাই সার্স-কোভ-২-এর সঙ্গে এসিই-২ সংযুক্তি অঙ্গের কার্যকলাপের ওপর নিশ্চিতভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

হার্ড ইমিউনিটি সমাধানের উপায়

একটি জনগোষ্ঠীর কমপক্ষে ৭০ শতাংশ মানুষ যখন কোনও সংক্রমণ রুখতে সক্ষম হন (পরিভাষায় ইমিউন হন), বাকি মানুষেরা তখন সেই রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। এই ধারণাটাকেই বলে হার্ড ইমিউনিটি। কোনও রোগের বিরুদ্ধে কোনও জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ মানুষকে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, অন্ততঃ ৭০ শতাংশের দেহে ধরা যেতে পারে সংক্রমণ রোখার উপযোগী অ্যান্টিবডি তৈরি হল। এক্ষেত্রে একে হার্ড ইমিউনিটি[১৩] বলে।

অপরদিকে স্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত কোনও জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশ মানুষের দেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি পরোক্ষভাবে বাকি জনগোষ্ঠীর মানুষকে রোগের সংক্রমণ থেকে বিরত করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। তবে এই জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশকে আক্রান্ত হতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগে। সেই সময়ে অপেক্ষাকৃত রোগ প্রতিরোধে অক্ষম দুর্বল মানুষের মৃত্যু অবধারিত। সংক্রামক রোগটির মৃত্যুহার যদি ৫-১০ শতাংশও হয়, তবে ভাবুন কয়েক কোটি জনসংখ্যার কোনও দেশে বেশ কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত।

দেশে লকডাউন না করে এই প্রকার ভ্রান্ত হার্ড ইমিউনিটির মাধ্যমে কোভিড-১৯-কে হারাতে চেয়েছিল উত্তর ইউরোপের দেশ সুইডেন। সে দেশের মুখ্য এপিডেমিলজিস্ট অ্যাণ্ডার্স টেগনেল বিশ্ববন্দিত জার্নাল 'নেচার' পত্রিকাতে এপ্রিস মাসের গোড়ায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই স্ট্র্যাটেজি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু জুন মাসে দেখা গেল ১ কোটি জনসংখ্যার দেশ সুইডেনে আক্রান্ত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার এবং মারা গেছেন প্রায় ৫ হাজার মানুষ। এবার ভাবুন, আমরা যদি আমাদের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে এইভাবে ন্যাচারাল ইমিউনিটির আশায় বসে থাকি, তবে কত লক্ষ মানুষের মৃত্যু গুণতে হবে! তাই এইভাবে যে এই সমস্যার মানবিক সমাধান সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়।

এই মুহূর্তে যেহেতু ভ্যাকসিন বা টীকা হাতে নেই, তাই 'অ্যাকটিভ হার্ড ইমিউনিটি' গড়ে তোলাও সম্ভব হচ্ছে না। কোভিড-১৯-এর জন্য আবার অ্যান্টি-ভাইরাল ড্রাগ (মেডিসিন) এখনও তৈরি হয়নি। তাই রোগমুক্তি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। তবে উপায়? উপায় একটাই, তা হচ্ছে প্রত্যেকের নিজস্ব ইমিউনিটির ওপর আস্থা রেখে নভেল করোনা ভাইরাস থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা।

পার্সোনাল ইমিউনিটি কীভাবে কাজ করে?

প্রথমেই একটা জিনিস জেনে রাখা ভাল। আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যে প্রতিরোধী শক্তি বা ইমিউনিটি রয়েছে তা একেবারেই আমাদের নিজস্ব, যা প্রত্যেকের প্রতিরক্ষাতন্ত্র বা ইমিউন সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ প্রত্যেকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু আলাদা আলাদা, যা তার জেনেটিক মেকআপ বা জিনগত চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য একই ঠান্ডা ও জোলো পরিবেশ থেকে কারও কারও সর্দি-জ্বর হয়, কেউ কেউ দিব্যি সুস্থ থাকেন। আমাদের প্রতিরক্ষাতন্ত্র খুবই সুনিয়ন্ত্রিত একটি শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থাপনা। এতে মূল চালিকাশক্তি হিসাবে রয়েছে কিছু কোষ ও কিছু জৈব-অণুর কার্যকলাপ। প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে যে ডিএনএ অণু থাকে তার মধ্যে অবস্থিত জিনের নিয়ন্ত্রণে কোষগুলি কাজ করে। ইমিউন কোষের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। তারা তাদের জিনের নির্দেশেই কোষীয় কার্যকলাপ ও জৈব-অণু নিঃসরণ করে। আর তাই প্রত্যেক মানুষের জিনগত চরিত্রের ওপরই তাদের ইমিউন কোষের কার্যক্ষমতা নির্ভর করে, যা একে অপরের থেকে ভিন্ন।

ইমিউন বা দেহজ সুরক্ষার কোষ ছড়িয়ে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন টিস্যুতে। যেমন— ম্যাক্রোফাজ, ডেনড্রাইটিক কোষ প্রভৃতি। আবার কিছু সুরক্ষার কোষ রয়েছে রক্তে; যেমন— নিউট্রোফিল, মোনোসাইট, লিম্ফোসাইট, ন্যাচারাল কিলার কোষ ইত্যাদি। রক্তে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোষ লিম্ফোসাইট দুই ধরনের হয়—'টি'-লিম্ফোসাইট ও 'বি'-লিম্ফোসাইট। এরা বেড়ে ওঠে যথাক্রমে থাইমাস ও বোনম্যারো (অস্থিমজ্জা)-তে। তাই এই দুই অঙ্গের আদ্যাক্ষর থেকে এমন নাম। টি-লিম্ফোসাইট কোষীয় পদ্ধতিতে ও বি-লিম্ফোসাইট প্লাজমা কোষ এবং তা থেকে পরবর্তীতে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে দেহজ প্রতিরক্ষার কাজ করে।

রোগ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করলে দুই ধরনের লিম্ফোসাইট দুই প্রকার কোষ তৈরি করে। একটি হল ইফেক্টর কোষ, অপরটি মেমরি কোষ।[১৪] ইফেক্টর কোষ তৎক্ষণাৎ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অযাচিত শত্রু জীবাণুকে মারতে সক্রিয় হয়। টি-লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে এদের নাম সাইটোটক্সিক টি-লিম্ফোসাইট ও হেল্পার টি-লিম্ফোসাইট এবং বি-লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে প্লাজমা সেল, যা পরবর্তীতে অ্যান্টিবডি[১৫] তৈরি করে।

টি-মেমরি ও বি-মেমরি লিম্ফোসাইট শরীরের বিভিন্ন টিস্যুতে বিশেষ করে লিম্ফনোড, স্প্লীন, টনসিল ও অন্ত্রের পেয়ার্সপ্যাচ ইত্যাদি স্থানে গিয়ে বসে থাকে। পরবর্তী সময়ে সেই নির্দিষ্ট জীবাণুরা আবার

যখন আক্রমণ করে, তখন সেগুলোকে মারার জন্য লিম্ফয়েড মেমরি সেলগুলি ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে ইফেক্টর কোষে পরিবর্তিত হয়ে শত্রু মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন ঘটে চলা ছোটখাট সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনা নীরবে কাজ করে চলেছে।

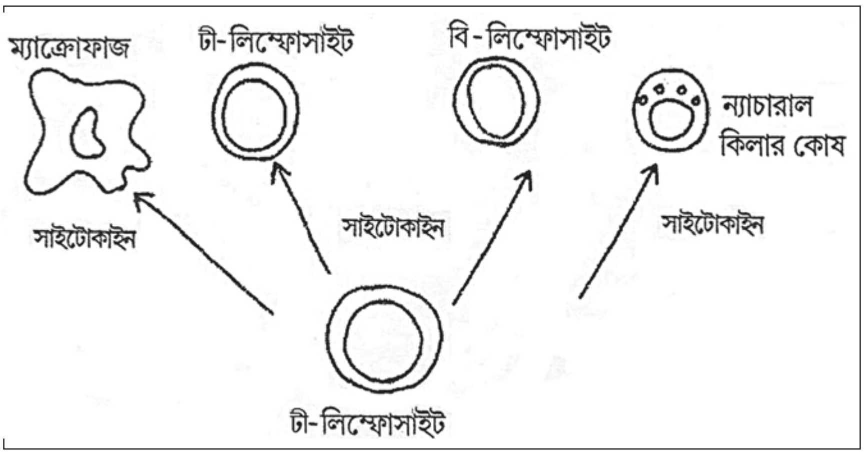

পার্সোনাল ইমিউনিটি কি প্রভাবিত করা যায়?

মারণক্ষম বা ভয়ানক ক্ষতিকর কোনও নির্দিষ্ট জীবাণু ও ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সেই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের প্রতিরূপ বা রেপ্লিকা শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—শরীরে মেমরি লিম্ফোসাইট তৈরি করে রাখা, যাতে তারা পরবর্তীতে সত্যি সত্যি এই বিশেষ ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঢুকে পড়লে, তাদের ওপর আঘাত হানতে পারে। এই রেপ্লিকা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করানোকেই টীকা প্রদান বা ভ্যাকসিনেশন এবং রেপ্লিকাটিকে ভ্যাকসিন বলে। ভ্যাকসিন প্রয়োগের ফলে ইফেক্টর কোষ প্রাথমিকভাবে যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, রক্তে তার উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি।

এভাবে ব্যক্তিগত স্তরে ভবিষ্যৎ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে 'অ্যাকটিভ ইমিউনিটি'[১৫ক] গড়ে তোলাকে কাজে লাগিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উপকার করা যায়। দেখা গেছে, ৬০-৭০ শতাংশ মানুষের শরীরে যদি কোনও ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরি হয়, তবে তা বাকি শতাংশ জনগোষ্ঠীকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। বাকিরা ভ্যাকসিন না পেলেও সুরক্ষিত থাকেন। এইভাবে জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ব্যবস্থাকে অ্যাকটিভ হার্ড ইমিউনিটি বলে। স্মলপক্স, পালস পোলিও, মিসলস্‌, ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিনেশনের কার্যকারিতা এই রীতিতেই ফলপ্রসূ হয়েছে।

হ্যাঁ, নভেল করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে এই অ্যাকটিভ হার্ড ইমিউনিটি কাজে আসতেই পারে। কিন্তু সেজন্য আমাদের হাতে একটি কার্যকরী ভ্যাকসিন (টীকা) গবেষণার মধ্যে দিয়ে পেতে হবে। তবে তা পেতে কম করে ১ বছর তো লেগে যাবেই।

বিশেষ খাবার খেয়ে ইমিউনিটি বাড়বে?

ভিটামিন সি-র উৎস হিসাবে লেবু এবং সেই সঙ্গে কাঁচা হলুদ, রসুন, আদা, নিমপাতা, মধু, শাকসব্জি খাওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে—ইমিউনিটি বাড়িয়ে করোনা প্রতিরোধ করার জন্য। এমনকি এই উদ্দেশ্যে বাজারে এসেছে 'ইমিউনিটি সন্দেশ'।

জেনে হয়ত হতাশ-ই হবেন—খাবার খেয়ে শরীরের ইমিউনিটি বাড়ানোর প্রামাণ্য কোনও গবেষণাপত্র নেই। ইমিউন কার্যকলাপ যেহেতু ইমিউন কোষের জিনের দ্বারা পরিচালিত (আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে), কোনও খাবারেই ডিএনএ বা জিনকে প্রভাবিত করার কোনও উপাদান থাকে না। তবে হ্যাঁ, জিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের সময় (পড়ুন অ্যান্টিবডি, সাইটোকাইন প্রভৃতি প্রোটিন তৈরির সময়) কাঁচামাল হিসাবে অ্যামিনো অ্যাসিড অথবা কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কিছু পদার্থ (সেলেনিয়াম, ভিটামিন-সি) দেহে কম থাকলে সরবরাহ করা সামগ্রীগুলো কাজে লাগে। এতে করে ইমিউন সেলগুলো তার

নিজস্ব ক্ষমতায় কাজ করতে পারে; হতোদ্যম হয়ে পড়ে না। কিন্তু খাবারের মাধ্যমে সরবরাহ করা সামগ্রী কখনই 'ইমিউনিটি পাওয়ার'-কে বাড়াতে পারে না। সেটা ব্যক্তিমানুষের জন্য নির্দিষ্টই থাকে।

সুসম আহার ও হালকা ব্যায়াম (বা যোগাভ্যাস) শরীরকে ফিট ও মনকে সতেজ রাখে (মানসিক চাপ কমায়)। আর তাই শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গে ইমিউন সিস্টেমও তার নিজস্ব ক্ষমতায় সর্বোৎকৃষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয়। সেজন্য এই অভ্যাস সব সময়ের জন্যই অনুকরণীয়।

সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফল করোনা মোকাবিলায় আনতে পারে আমূল পরিবর্তন ঃ বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ যখন করোনার ভ্যাকসিন বাজারে আসার অপেক্ষায় দিন গুনছেন, তখুনি সামনে এল নজরকাড়া দুটি গবেষণার ফলাফল। অতি সম্প্রতি সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইন্সস্টিটিউট ও ইতালির রোমে অবস্থিত ব্যামবিনো গেসু চিল্ড্রেনস্ হসপিটাল-এর রিসার্চ ল্যাবরেটরীর গবেষণালব্ধ ফল থেকে জানা গেল, করোনা রুখতে অ্যান্টিবডি নয়, সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি বেশি কাজের। শরীরের টি-লিম্ফোসাইট ও ন্যাচারাল কিলার সেল করোনা মোকাবিলার দুটি প্রধান অস্ত্র। গবেষণা নিবন্ধগুলো জমা পড়েছে বায়ো ও মেডিক্যাল আর্কাইডে।

জানা গেছে, মনোসাইট ও ন্যাচারাল কিলার সেল-এর আনুপাতিক উপস্থিতি কোভিড-১৯ রোগটির প্রোগনসিস বা পরিণতি নির্ধারণ করে। লক্ষণহীন আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে ন্যাচারাল কিলার কোষ যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়ে যায়। পাশাপাশি কিছুটা হলেও রক্তে দেখা যায় আইজি-এ শ্রেণির অ্যান্টিবডি। অন্যদিকে, প্রবলভাবে আক্রান্ত রোগীদের রক্তে ধীরগতিতে মনোসাইটের সংখ্যা বেড়ে চলা এবং বহুদিন পর্যন্ত আইজি-এ ও আইজি-জি শ্রেণির অ্যান্টিবডির মাত্রা বজায় থাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার কম উপসর্গযুক্ত রোগীদের শরীরে (রক্তে) মনোসাইটের সংখ্যাধিক্য এবং আইজি-এ ও আইজি-জি শ্রেণির অ্যান্টিবডির সামান্য উপস্থিতি নজরে আসে।

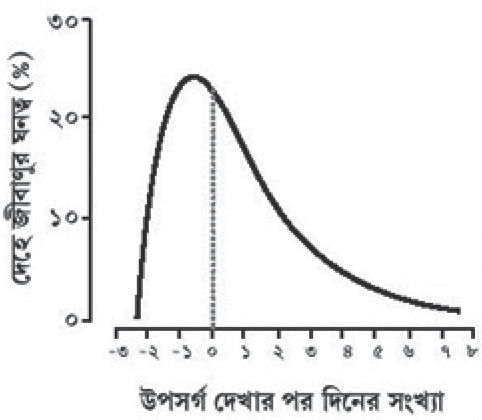

নেচার রিপোর্ট

উপসর্গ দেখা দেওয়ার ৩২ দিন পর্যন্ত ৯৪ জন কোভিড পজিটিভ রোগীর থেকে ৪১৪টি লালারসের নমুনা নেওয়া হয়েছে। দেখা গিয়েছে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার ১৮ ঘণ্টা আগে ভাইরাল লোড সবচেয়ে বেশি হয়। ২০ দিন পর লোড সবচেয়ে কম থাকে। কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল হয় সংক্রমিত হওয়ার ৩৭ দিন পর।

গবেষণায় দেখা গেছে, লক্ষণহীন আক্রান্তদের মধ্যে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সেরোনেগেটিভ পরিবারের সদস্যদের রক্তে টি-লিম্ফোসাইটের সংখ্যা থাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। এই গবেষণায় আরও উঠে এসেছে সার্স-কোভ-২ ভাইরাস আক্রান্তের দেহে প্রচুর পরিমানে 'মেমরি' টি-লিম্ফোসাইট তৈরি করে, যা কিনা ভবিষ্যতে করোনা মোকাবিলায় কাজে লাগবে। অর্থাৎ আক্রান্ত অথচ লক্ষণহীন ব্যক্তির দেহে টি-লিম্ফোসাইট তৈরি হওয়ায় ভবিষ্যতেও তিনি করোনা মোকাবিলায় সক্ষম হবেন। আর এখানেই আশার আলো দেখছেন গবেষকরা। টি-সেল ভ্যাকসিন তৈরির মধ্যে দিয়ে যদি টি-মেমরি লিম্ফোসাইট তৈরি করা যায়, তবে কেল্লাফতে। করোনার হাত থেকে মুক্তির উপায় হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে। তবে সেক্ষেত্রে বর্তমানে সারাবিশ্বে যে ধরনের ভ্যাকসিন উৎপাদন ও বাজারীকরণ নিয়ে চর্চা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে। কারণ এগুলো সবই বি-সেল ভ্যাকসিন, যা কিনা বি-লিম্ফোসাইট মেমরি সেল বা অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য প্রয়োগ করা হবে।

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী বি-মেমরি লিম্ফোসাইট তৈরি করতে পারে না বলে এই গবেষণায় উঠে এল, সেহেতু আইজি-জি অ্যান্টিবডি তৈরির মধ্যে দিয়ে হার্ড ইমিউনিটি তৈরির তত্ত্বও খারিজ হয়ে গেল। উপরন্তু দেখা গেল, লক্ষণহীন ব্যক্তির শরীরে বেশিদিন আইজি-জি অ্যান্টিবডি থাকে না; থাকে আইজি-এ শ্রেণির অ্যান্টিবডি, তাই আইজি-জি সেরোসার্ভিল্যান্সও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কাজেই সাম্প্রতিক এই দুই গবেষণার ফল যে বর্তমান বিশ্বের করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত ভাবনা ও কার্যকলাপকে প্রভাবিত করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের ধরন

এপ্রিল মাসে 'নেচার' সার্স-কোভ-২ সৃষ্ট কোভিড-১৯ রোগের ইনকিউবেশন পর্ব সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। 'ইনকিউবেশন পর্ব' হচ্ছে কোন ব্যক্তির দেহে ভাইরাস (বা কোনও জীবাণু)-এর প্রবেশ ও ব্যক্তিটির দেহে রোগলক্ষণ (অর্থাৎ উপসর্গ) প্রকাশিত হবার মধ্যবর্তী সময়কাল। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার ৩২ দিন পর্যন্ত পজিটিভ রোগীর থেকে ৪১৪টি লালারসের নমুনা নেওয়া হয়েছে। দেখা গিয়েছে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার ১৮ ঘন্টা আগে ভাইরাল লোড সবচেয়ে বেশি হয়। ২০ দিন পর লোড সবচেয়ে কম থাকে। কিন্তু পুরোপুরি নির্মূল হয় সংক্রামিত হওয়ার ৩৭ দিন পর। গবেষণাটি থেকে স্পষ্ট প্রি-সিম্পটোম্যাটিক ট্রান্সমিশন[১৫খ] এক্ষেত্রে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগে রোগী বা তার আশেপাশের লোকজনের সতর্ক হওয়ার কোনও উপায় নেই। রোগী যখন বুঝতে পারছেন, তখন তাঁর শরীরে বাসাবাঁধা জীবাণু অনেকটাই ডালপালা মেলে ফেলেছে সংস্পর্শে আসা মানুষদের মধ্যে। রোগ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে যাঁদের খোঁজ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। যে কারণে করোনা মোকাবিলায় 'কনট্যাক্ট ট্রেসিং'[১৬]-এর ওপর প্রবল গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সাধারণতঃ কোনও আক্রান্ত ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীতে কতজনের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম, তা রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার হিসাবে ব্যক্ত করা হয় এবং সেটি Ro হিসাবে সূচিত হয়। কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে এটা জানা গেছে Ro মান গড়ে ৩। অর্থাৎ কোনও কোভিড-১৯ আক্রান্ত মানুষ গড়ে ৩ জনকে রোগ ছড়াতে পারে।

গবেষণায় উঠে এসেছে, সমস্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি ভাইরাস সংক্রমণ ছড়ায় না। পক্ষান্তরে, কেউ কেউ ৩ এর বেশি, এমনকি ৫০-৬০ জনকে রোগ ছড়াতে সক্ষম। এদের 'সুপার স্প্রেডার' বলে। লন্ডন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর তথ্যভান্ডার থেকে উইনান নাইট জানিয়েছেন, সুপার স্প্রেডিং-এর ঘটনা কোভিড-এর ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অন্তত ১১৬০ জনের মধ্যে নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার নেপথ্যে দায়ী এক মহিলা। যাকে চিহ্নিত

করা হয়েছে রোগী নম্বর ৩১ হিসাবে। প্রাথমিক উপসর্গ দেখে এই মহিলাকে চিকিৎসকরা আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ না মেনে মহিলাটি গির্জায় যান, প্রার্থনায় অংশ নেন। পরে একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে নৈশভোজও করেন। শহরের অন্তত ৬০ শতাংশ মানুষের করোনা আক্রান্ত হওয়ার পিছনে দায়ী তিনি।

এরকমই সুপার স্প্রেডারদের উপস্থিতি চোখে পড়েছে ম্যাসাচুয়েটস্-এর একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের অব্যবহিত পরে।

পাঞ্জাবের পাথলায়া গ্রামের বাসিন্দা এবং গুরুদ্বারের পূজারী বলদেব সিং জার্মানি, ইতালি ঘুরে ৭ মার্চ ভারতে ফিরেছিলেন। কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে না থেকে সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, স্থানীয় অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে জানা যায়, তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে আসা ঐ গ্রামের কয়েকশো মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

গুজরাটের আমেদাবাদে ৩৩৪ জন মানুষকে চিহ্নিত করা হয়। এই তালিকায় সব্জি বিক্রেতা, সাফাইকর্মী, দোকানীরা ছিলেন। এরা সবাই ছিলেন 'সুপার স্প্রেডার'।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ লিওড স্মিথ-এর মতে, বেশিরভাগ মানুষ কোভিড-এর ভাইরাস ছড়ায় না। কেবলমাত্র কিছু মানুষ করোনা ভাইরাস ছড়ায়, যা এক একটি গোষ্ঠীকে মারাত্মকভাবে সংক্রামিত করে তুলতে পারে। আর তাই অধিকাংশ বিজ্ঞানী বর্তমান Ro এর মান ছাড়াও 'ডিসপার্সন ফ্যাক্টর'-কে গুরুত্ব দিচ্ছেন, যা 'K' দ্বারা সূচিত হয়। কী এই ডিসপার্সন ফ্যাক্টর? কোনও রোগ কোনও গোষ্ঠীতে কীভাবে ছড়ায়, এটা তারই একটা সূচক, 'K'-র মান যত ছোট হবে, রোগটিতে খুব ছোট সংখ্যার মানুষের থেকে বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে। যেমন— কোভিড-এর ক্ষেত্রে এটি ০.১, সার্স-এর ক্ষেত্রে ০.১৬, মার্স-এর ক্ষেত্রে ০.২৫ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার (ফ্লু)-এর ক্ষেত্রে ১, জানাচ্ছেন লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন ও ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর বিশেষজ্ঞ আদম কুচারস্কি। তাঁর হিসাবে অনুযায়ী একটি জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশ আক্রান্ত মানুষ ৮০ শতাংশ মানুষকে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করে ফেলতে পারে।

এতদিন জানা ছিল কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ড্রপলেট বা জলকণার মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি ও লালারসের মাধ্যমে ভাইরাস সমৃদ্ধ ছোট-বড় জলকণা তাঁর খুব কাছে থাকা কোনও ব্যক্তির শরীরে প্রবেশের করে ও সংক্রমণ ছড়ায়; অথবা সেই ভাইরাসযুক্ত জলকণা আক্রান্ত ব্যক্তি নিকটবর্তী কোনও বস্তুতে পড়ে থাকার ফলে তা হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির কাছে চলে যেতে পারে। পরবর্তীতে সুস্থ ব্যক্তির সেই হাত অসাবধানতা জনিত কারণে তাঁর নিজের নাকে মুখে চলে গেলে, তা থেকেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এইভাবে সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম বস্তুকে বলে 'ফোমাইটস্'।

সম্প্রতি কোভিড-এর বায়ুবাহিত সংক্রমণ তত্ত্বের সম্ভাবনার কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা। এটা দেখা গেছে, সাধারণভাবে কথা বলার সময় আমরা ১ থেকে ৫০০ μm (মাইক্রোমিটার) সাইজের কয়েক হাজার জলকণা বার করি। এই সমস্ত জলকণাগুলো শ্বাসযন্ত্রের রোগের জীবাণু যেমন, টিবি-র জীবাণু, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মিসলস্ ভাইরাস বহন করে। এদেরই মত কোভিড-১৯-এর ভাইরাস (সার্স-কোভ-২) ও এই ধরনের জলকণার মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে, জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। 'লেসার-বীম'[১৭]-এর সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, বদ্ধঘরে কথা বলার সময়ে নিঃসৃত জলকণা (৪ μm সাইজের) প্রায় ১৪ মিনিট পর্যন্ত বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। বদ্ধঘরে, বিশেষত এসি চলছে, এমন ঘরে এই ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অবশ্য খোলামেলা অবস্থায় বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তবে বাতাসের মাধ্যমে সার্স-কোভ-২ ঠিক কত ফুট একজন আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে, সে বিষয়ে অবশ্য দ্বিমত আছে বিজ্ঞানীমহলে, কেউ কেউ বলেছেন ১০ ফুট, আবার কেউ কেউ ৩০ ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন। এ বিষয়ে যে আরও গবেষণা প্রয়োজন তা আর বলতে অপেক্ষা রাখে না।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে আমরা এখন এতটাই চিন্তিত যে, অন্যের শরীরে রোগজীবাণুর সম্ভাব্য ডেরা নিয়ে সংশয় তো আছেই, নিজের মাথার চুল থেকে পরনের জামা, গালের দাড়ি, পায়ের জুতো নিয়েও ভাবনার অন্ত নেই। বাইরে বেরোলে করোনা ভাইরাস কি জামা প্যান্টের ওপর লেগে ঘরে চলে আসবে? জুতো কতটা ভাইরাস বহন করে? চুলদাড়ি থেকে কি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে? বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, জামা-জুতো নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। স্বল্প সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে বেরোলে জামা-প্যান্ট পাল্টানোরও প্রয়োজন নেই। তবে হাসপাতাল বা বাজারের মত জনবহুল জায়গায় গেলে অবশ্য কিছুটা সতর্কতা দরকার। জামাকাপড় সহ পরিধানের সবকিছু লন্ড্রিতে পাঠানো জরুরি নয়। বাড়িতে সাধারণ সাবানজলে কাচলেই যথেষ্ট। আমেরিকার ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর ডা. অ্যান্ড্রু জনস্কি ও ভার্জিনিয়া টেকনোলজির এরোসোল বিজ্ঞানী ডা. লিনসেমারের যুক্তি, 'আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবে আছি। কিন্তু আমাদের গতি কম থাকায় ভাসমান কোনও জীবাণু জামাকাপড়ে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ঠিক যেমন গাড়ির গতি কম থাকলে পোকামাকড় উইন্ডস্ক্রিনে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। গতি বাড়ালে বাড়ে সম্ভাবনা। অর্থাৎ গতি কম থাকার জন্যই আমাদের জামাকাপড়ে ভাইরাস লেগে গেলেও তার 'লোড' অনেক কম হবে। ফলে, দ্রুত তা শুকিয়ে যাবে।'

মার্কিন গবেষকদের পর্যবেক্ষণ, নভেল করোনা ভাইরাস বাতাসে কয়েক মিনিট ভেসে থাকতে পারে। তবে মশা-মাছির মত তা ওড়ে না। বাতাসের অভিমুখে ভেসে যায়। কাছাকাছি কোনও সংক্রামিত মানুষ হাঁচলে বা কাশলে তবেই এই সম্ভাবনা তৈরি হয়। গবেষণা বলছে, ধাতব সামগ্রীর ওপর ৪৮ ঘন্টা এবং প্লাস্টিকের ওপর এই ভাইরাস ৭২ ঘন্টা সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। ২০05 সালে কাপড়ের গাউনের ওপর পরীক্ষা চলেছিল। তখন দেখা গেছিল, সুতির বস্ত্রের ওপর করোনা গোত্রের ভাইরাস জীবন হারায় তাড়াতাড়ি। কারণ

ভাইরাসের গায়ে যে লিপিডের আবরণ থাকে, তা সুতির কাপড়ে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাঁচি-কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসা ড্রপলেটের আয়তনে খুব ছোট হয় (মাইক্রন সাইজের)। বাতাসে ভাসার পর আরও ছোট হয়ে যায়। ফলে সংক্রমণের জন্য যত ভাইরাস লোড দরকার, তা বাতাসে থাকে না। যদি না কেউ আচমকা আমাদের গায়ের ওপর হেঁচে দেয়। তেমন হলে কিন্তু জামাকাপড় ধুয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পোষাকের মতই চুলদাড়িতে ভাইরাসের সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা নেই। তাই প্রতিবার বাড়ির বাইরে থেকে ফিরে স্নান করার প্রয়োজন নেই। আর বাইরে থেকে ফিরে দরজার পাশের নির্দিষ্ট জায়গায় জুতো রেখে খালি পায়ে ঘরে প্রবেশ করবেন। জুতো পরে ঘরের চারিদিকে হাঁটাহাঁটি করবেন না।

প্রাণীদেহে কোভিড-১৯ উদ্বেগের কতটা?

এই বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি হংকং-এ প্রথম একটি পোমেরিয়ান জাতের কুকুরে নভেল করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সে দেশের কৃষিদপ্তর খবর দেয়, কুকুরটির মালিক কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ছিলেন। ১৮ মার্চ একটি বিড়ালের শরীরে নভেল করোনা ভাইরাসের আরএনএ-র উপস্থিতি নথিভুক্ত করেন 'লীগ' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারী মেডিসিন অনুষদের গবেষকরা।

১৫ এপ্রিল হংকং-এ দুটি কুকুরের শরীরে ধরা পড়ে নভেল করোনা ভাইরাস। এপ্রিল মাসে আরও একটি বিড়াল আক্রান্ত হয় হংকং-এ। তার মালিকও করোনা পজিটিভ ছিলেন।

এপ্রিল মাসের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসডিএ-র অন্তর্গত ন্যাশানাল ভেটেরিনারী ল্যাবরেটরী নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত 'ব্রনক্স' চিড়িয়াখানায় 'নাদিরা' নামের এক বাঘিনী সাস-কোভ-২ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর দেয়। উল্লেখ্য, সেই চিড়িয়াখানায় পাশাপাশি খাঁচায় ৫টি বাঘ ও ৩টি সিংহ ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই বাকি সমস্ত বাঘ ও সিংহের মধ্যেও কোভিড-এর মৃদু সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, ঐ সমস্ত প্রাণীদের পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত কর্মচারীটি কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন। তার থেকেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে অনুমান। নাদিরার লালারস আগেই পরীক্ষা করা হয়েছিল, যা পজিটিভ রেজাল্ট দেয়। এবার বাকি প্রাণীদের মল পরীক্ষা করে দেখা যায়, সকলেরই রেজাল্ট পজিটিভ। কর্তৃপক্ষ জানায়, এই সমস্ত বাঘ ও সিংহের শ্বাসের সমস্যা থাকলেও তারা স্বাভাবিক আছে, এমনকি চিড়িয়াখানার অন্যান্য প্রাণীতে রোগ ছড়িয়ে পড়েনি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আশ্বাস, পোষ্য থেকে মানুষের সংক্রামিত হওয়ার কোনও নজির এখনও নেই। বায়োলজি প্রিপ্রিন্ট আর্কাইভে প্রকাশিত চিনা বিজ্ঞানীদের একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বিড়াল নভেল করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হতে পারে। অন্য বিড়ালে ভাইরাস ছড়িয়েও দিতে পারে, তবে মানুষে ছড়ায় না। তাই দুশ্চিন্তা ও প্রাণীবিদ্বেষ একেবারেই নয়। চিনের অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের অধীন হারবীন ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নভেল করোনা ভাইরাসটি পোষ্য থেকে মানুষে ছড়ায় কি না, তা দেখার জন্য বিড়াল, কুকুরকে বেছে নিয়েছিলেন। বেছে নেওয়া হয় প্রাণীপালনের তিন সম্পদ শুয়োর, হাঁস ও মুরগিকেও। এই তিন প্রাণী যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, তা উঠে এসেছে গবেষণাটি থেকে। কারও সোয়াব নমুনাতেই আরএনএ-র উপস্থিতি পাননি তাঁরা। ভয় নেই বিড়াল, কুকুর নিয়েও। গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বিড়ালের শরীরে করোনা ভাইরাসের আরএনএ-র রেপ্লিকেশন[১৮] হয়। শ্বাসযন্ত্রের কার্যকলাপের মাধ্যমে অন্য বিড়ালকেও সংক্রামিত করতে পারে। কিন্তু মানুষের দেহে রোগ ছড়াতে পারে না। পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত কোনও বিড়ালই অসুস্থ হয়ে পড়েনি। উপরন্তু আক্রান্ত বিড়ালের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরির প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মিঙ্ক (লোমযুক্ত ইঁদুরের চেয়ে বড় প্রাণী)

মানুষের ফুসফুসের ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় ল্যাবরেটরী প্রাণী 'ফেরেট'-এর ব্যবহার প্রচলিত। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ ফেরেটে করোনা সংক্রমণ বেশি, তবে কুকুরের সংক্রমণের সম্ভাবনা কম। দুটি ফেরেট ও কুকুরের ওপর নিরীক্ষণ চালিয়ে দেখা যায় কুকুরের পায়ুর সোয়াবে ভাইরাসের আরএনএ-র উপস্থিতি মিললেও সংক্রমণের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়নি।

বড় ইঁদুরের মত দেখতে লোমশ প্রাণী 'মিঙ্ক'। নেদারল্যান্ড-এ মিঙ্ক চাষ করা হয়। সেদেশে মিঙ্কের অনেক খামার আছে। মিঙ্কের চামড়ার ফার (লোম) দিয়ে শীতবস্ত্র তৈরি করা হয়। মে মাসের গোড়ায় দুটি খামারে মিঙ্কের মধ্যে অসুস্থতা দেখা যায়। সোয়াব টেস্টে কোভিড ধরা পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, একজন খামার পরিচর্যাকারীর কোভিড সংক্রমণ ছিল। পরে খামারে ঘুরে বেড়ানো বিড়ালের মাধ্যমে রোগ ছড়িয়েছে বলে অনুমান করা হয়। নেদারল্যান্ড-এর সমস্ত মিঙ্ক ফার্ম বন্ধ করে দেয় সে দেশের সরকার। অনুতাপের বিষয়, কয়েক হাজার মিঙ্ককে মেরে ফেলা হয়, অথচ সরকারিভাবে বলা হয়, মিঙ্কের থেকে মানুষে কোনও রোগ ছড়ায়নি।

করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক পরা কতটা জরুরি?

অতিমারী (প্যানডেমিক) ঘোষণার পরবর্তী সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) মাস্কের ব্যবহার নিয়ে যে নির্দেশিকা বের করেছিল (২৯ জানুয়ারি, ২০২০) তাতে স্পষ্ট জানিয়েছিল—"সুস্থ সাধারণ মানুষের মাস্ক

ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই। রোগ ছড়ানো ঠেকাতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের মাস্ক পরা একান্ত জরুরি। হাসপাতালে থাকাকালীন অসুস্থ মানুষের পরিষেবায় যুক্ত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সার্জিক্যাল মাস্ক নয়, কেবলমাত্র আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট

অফ অকুপেশনাল হেলথ্ অনুমোদিত 'এন-৯৫' অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনুমোদিত 'এফএফপি-২' মাস্ক।"

এরপর কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। একদিকে যেমন বিশ্বের নানা প্রান্তে কোভিড ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি রোগটি সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য পরীক্ষালব্ধ ফল ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীরা ঋদ্ধ হয়েছেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ামক সংস্থাগুলিও তাদের স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক নির্দেশিকাগুলি পরিমার্জিত করেছে।

কোভিড সংক্রমণ যে মূলতঃ সংক্রামিত মানুষ থেকে হাঁচি কাশির মাধ্যমে, ভাইরাস সমৃদ্ধ জলকণা (ড্রপলেট) বাতাসে ভেসে সুস্থ মানুষে চলে আসার ফলে হয়, তা আগেই জানা গেছিল। সম্প্রতি গবেষণায় উঠে এসেছে, অপেক্ষাকৃত ছোট জলকণা (৫ মাইক্রন সাইজের) অর্থাৎ ড্রপলেট নিউক্লিয়াই বা ড্রাইভাইরাল পার্টিক্যাল (০.৫ থেকে ৫ মাইক্রন সাইজের) সংক্রামিত মানুষ থেকে কথা বলা, গান গাওয়া বা স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ছাড়ার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে কিছুক্ষণ (প্রায় ১৪ মিনিট) ভাসতে পারে, এমনকি আবদ্ধ ঘরে ৮ মিটার (২৬ ফুট) চলে যেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে সহজেই অনুমেয় আক্রান্ত ব্যক্তি ও সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমণ রোধ করতে উভয়েরই মাস্ক পর দরকার। তবে এই মাস্কের গুণমান ও মাস্ক পরার পদ্ধতি সঠিক হওয়া চাই। আপাত সুস্থ সাধারণ মানুষের জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও কাচা যায় এমন ত্রিস্তরীয় কাপড়ের মাস্ক ব্যবহারের কথা হু-এর নির্দেশিকায় (৫ জুন, ২০২০ প্রকাশিত) পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে।

ত্রিস্তরীয় মাস্কের উপাদান বিস্তারিত আলোচনার আগে, মাস্ক সম্বন্ধীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নেওয়া যাক। একটি হচ্ছে মাস্কের ভাইরাস-প্রতিরোধক ক্ষমতা বা বাতাস ফিল্টার করার ক্ষমতা; আর একটি হচ্ছে ব্যবহারকারীর শ্বাস নেওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বা 'ব্রিদেবিলিটি'। দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে একটি মান নির্ণয় করা হয়, তাকে বলে 'কোয়ালিটি ফ্যাক্টর', যা 'হু' দ্বারা অভিহিত করা হয়।

একটি ভাল মাস্কের বাতাস ফিল্টার করার ক্ষমতা হতে হবে ন্যূনতম ৭০% অর্থাৎ ৭০% বাতাসের মধ্যেকার ভাইরাস ভাল মাস্কের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে পারবে না। আর শ্বাসের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে গেলে মাস্কের ভিতর ও বাইরের বাতাসের চাপের তারতম্য হতে হবে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে সর্বাধিক ০.৬ মিলিবার।

চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা সার্জিক্যাল মাস্ক বা প্রয়োজনে এন-৯৫ বা এফএফপি-২ ব্যবহার করলেও সাধারণ সুস্থ মানুষের জন্য নন- সার্জিক্যাল মাস্কই যথেষ্ট। সাবান-জলে ধুয়ে বারবার ব্যবহার করা যায় বলে খরচ বাঁচে। দেখা গেছে, পাশাপাশি সজ্জিত ফাইবারগুলোর মধ্যেকার অংশে ফাঁক থাকে বলে সুতির শাড়ির কাপড়, গেঞ্জি-কাপড় বা রুমাল-কাপড়ের তৈরি মাস্ক-এর ভাইরাস-রোধী ক্ষমতা খুবই নগণ্য অর্থাৎ এভাবে তৈরি মাস্ক প্রকৃতপক্ষে অকার্যকর। তাই কার্যকরী মাস্কের উপাদানে একটু বদল আনা হয়েছে।

হু-প্রস্তাবিত ত্রিস্তরীয় মাস্কের তিনটি স্তরের বাইরের দিকটি হবে 'হাইড্রোফোবিক' (জলরোধী), যা পলি-প্রোপাইলিন দ্বারা তৈরি, মাঝের স্তরটিও হাইড্রোফোবিক, যা পলি-প্রোপাইলিন বা জল শোষণে অক্ষম এমন তুলো দিয়ে তৈরি হবে এবং ভিতরের স্তর হবে হাইড্রোফিলিক,[১৯] যা তৈরি হতে পারে সুতির কাপড় দিয়ে।

মুস্কিল হচ্ছে, হু-প্রস্তাবিত মাস্ক এখনও বাজারে আসেনি। সরকারি বা বেসরকারি কোনও উদ্যোগও দেখা যায়নি, এই ধরনের মাস্ক তৈরি ও বিপণন/বন্টনে। তাই বাস্তব কথা মাথায় রেখে আমাদের নিজেদেরই উপায় বের করতে হবে।

বাজারে চলতি ভালমানের ত্রিস্তরীয় মাস্ক ন্যূনতম হিসাবে ব্যবহার করা চাই। ক্ষেত্রবিশেষে (সাময়িকভাবে হলেও) ভীড়ে বা বেশি মানুষে উপস্থিতিতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে একটি অতিরিক্ত সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা 'ফেসশিল্ড' ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেহেতু আমরা জানি না, যার সান্নিধ্যে আমরা রয়েছি, তিনি আক্রান্ত (এমনকি উপসর্গহীন) কিনা, তাই সংক্রমণ ঠেকাতে প্রত্যেকেরই

মাস্ক পরা উচিত। তবে এর সঠিক ব্যবহারের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে এটা যেন নাক ও মুখ ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয়, ফ্যাশন প্রদানের জন্য নয়। থুতনিতে টাঙানো বা কানের গোড়ায় আটকে থাকা মাস্ক না পরারই সামিল। 'ফিট' করে এমন চাপা মাস্ক

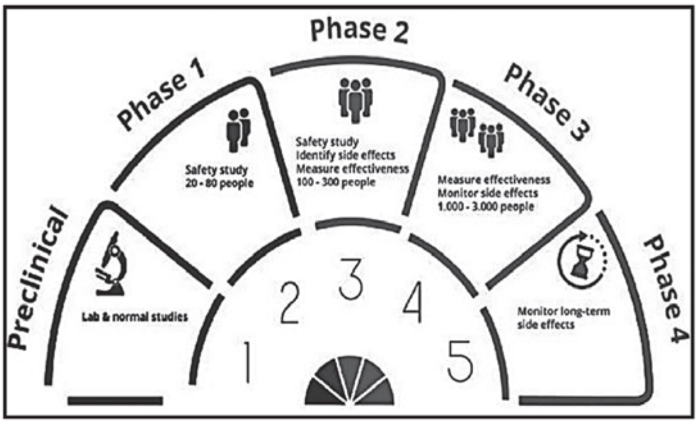

পরতে হবে, যাতে নাকের ও মুখের পাশে ফাঁক না থাকে। বারবার নাকের উপর হাত দিয়ে উপরে তুলে দেবার চেষ্টা কখনই করা উচিত নয়। অর্থাৎ মাস্কের বাইরের দিকটা একেবারেই হাত লাগানো উচিত নয়। কানে লাগানোর জন্য ব্যবহৃত স্ট্র্যাপটি হালকা করে খুলে মাস্কটি সাবান-জলে ধুতে হবে। খুব ভাল হয় যদি তা ১ মিনিট গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া যায়। রোদে শুকিয়ে নিয়ে পরেরবার ব্যবহার করা যাবে। বেশ কয়েকবার এভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে ও সমাজের অন্যদের বাঁচাতে মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। দেখা গেছে, আমরা প্রত্যেকে মাস্ক পরলে সংক্রমণের সম্ভাবনা ন্যূনতম করে ফেলা যায়। তাই সুনাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত ও যত্নবান হতে হবে।

করোনা ভ্যাকসিনের হালহকিকত

চ্যাডক্স-১ (এখন নাম এজেডডি-১২২২), কোভাক্সিন, এমআরএনএ-১২৭৩, জাইকোভ-ডি এখন আর আমাদের কাছে নতুন নাম নয়। খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেলের দৌলতে করোনা ভ্যাকসিনের নামগুলো অনেকেরই জানা হয়ে গেছে। করোনার অত্যধিক সংক্রমণ মোকাবিলায় চিকিৎসকরা যেমন তাকিয়ে আছেন নির্দিষ্ট ওষুধ ও টিকার (ভ্যাকসিন) দিকে, সাধারণ মানুষও প্রাণ বাঁচাতে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন কোনও জীবনদায়ী ওষুধ বা নিদেনপক্ষে একটি করোনা-রোধী টিকার। তাই কবে বাজারে আসছে করোনার ভ্যাকসিন—এই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা, তথ্যভিত্তিক আলোচনা। বরিস জনসন নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প? শি জিং পিং নাকি নরেন্দ্র মোদি? কার মুখে প্রথমে হাসি ফুটবে—তা নিয়ে সবাই ভীষণ উদগ্রীব।

ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল—বিশ্বের তাবড় শক্তিধর দেশগুলো নেমে পড়েছে ভ্যাকসিনের নাম করে বাজার ধরতে। ভারতও পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন দেশের কর্ণধারদের ভ্যাকসিন নিয়ে অতি সক্রিয়তা ও উদ্বোধন দিনের আগাম ঘোষণা শুধু দৃষ্টিকটু লাগছে, তাই নয়, তাঁদের মৌলিক বিজ্ঞান ভাবনার খামতি ফুটে উঠছে। নিরীক্ষার ফল অনুকূল বা মনোমত হবে যদি তা আগেই জানা থাকে, তবে সে গবেষণার কি আর সারবত্তা থাকে?

বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষের মনে ভ্যাকসিন নিয়ে কৌতূহল

চিত্র : টিকার কার্যক্ষমতা ও গুণমান যাচাই-এর উদ্দেশ্যে করা বিভিন্ন পর্যায় বা ফেজ

- প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল—মনুষ্যেতর প্রাণিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও সুরক্ষা যাচাই-এর পর্যায়
- ফেজ-১ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল—ন্যূনতম ২০-৮০ জন সুস্থ স্বেচ্ছাসেবীর ওপর মূলতঃ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যাচাই-এর পর্যায়
- ফেজ-২ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল—সাধারণতঃ ১০০-৩০০ জন সুস্থ স্বেচ্ছাসেবীর ওপর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও সুরক্ষার মান যাচাই-এর পর্যায়
- ফেজ-৩ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল—কমপক্ষে ১০০০-৩০০০ বিভিন্ন দেশ/মহাদেশোর স্বেচ্ছাসেবীর ওপর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও সুরক্ষার মান যাচাই-এর পর্যায়
- ফেজ-৪ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল—স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর প্রযুক্ত টিকার দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পর্যায়, যা সাধারণতঃ ৩-৫ বছর

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, স্বাভাবিক তো বটেই। সবাই না হলেও, অনেকেরই মনে নানা জিজ্ঞাসা ইতিউতি উঁকি মারছে। ভ্যাকসিনের হালহকিকতের অবতারণা তাঁদের কৌতূহল নিরসনের একটি প্রচেষ্টামাত্র।

ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আসলে বিশেষ কোনও রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত সেই রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রতিরূপ, যার মূখ্য উপাদান প্রোটিন জীবাণু (পরিভাষায় অ্যান্টিজেন)।[২০] রোগ-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা পরজীবীরা মুখ, নাক, চোখ, কান, ত্বক এমনকি যৌনাঙ্গ দিয়ে ঢুকে পড়লেও রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে কোনও রোগ-বালাই করতে পারে না। অবশ্য রোগক্ষম জীবাণু বা ভাইরাসরা এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে ও আমাদের রোগগ্রস্ত করে তোলে।

করোনা ভ্যাকসিন তৈরির দৌড়ে রয়েছে ১৭০টি ভ্যাকসিন। 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এর ভ্যাকসিন ট্র্যাকার অনুযায়ী ১৪০টি ভ্যাকসিন রয়েছে প্রি-ক্লিনিক্যাল (ল্যাবরেটরী প্রাণীদের মধ্যে পরীক্ষা চালাতে) পর্যায়ে। মানবদেহে ট্রায়াল বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ১৯টি টিকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ৪টি।

দৌড়ে এগিয়ে থাকা ভ্যাকসিনদের মধ্যে রয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাডক্স-১ কোভ-১৯, আমেরিকার মডার্ণা কোম্পানীর এম-আর এনএ- ১২৭০ ভ্যাকসিন, রাশিয়ার গ্যাম- কোভ-ভ্যাকসিন-লিও, ভারতের কোভ্যাকসিন ও জাইকোভ- ডি, চিনের সাইনোভ্যাক ও ক্যানসিনো। অতিমারী পরিস্থিতিতে 'ফাস্ট ট্র্যাক' করে সময় কমানো হলেও মানুষের ওপর পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফল অর্থাৎ এর কার্যকারিতা ও ন্যূনতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে তবেই এর উৎপাদন ও প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হতে পারে। ঠিক কবে করোনার কার্যকরী ভ্যাকসিন বাজারে আসবে ও মানবজাতির কাজে লাগবে, তার উত্তর সময়ই দেবে। তবে করোনা টিকা যখনই আমরা হাতে পাই না কেন, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল বর্তমান সময়ে মাস্ক পরা, হাত সাবান জলে ধোওয়া ও দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখার অভ্যাসই আদতে আমাদের রক্ষাকবচ।

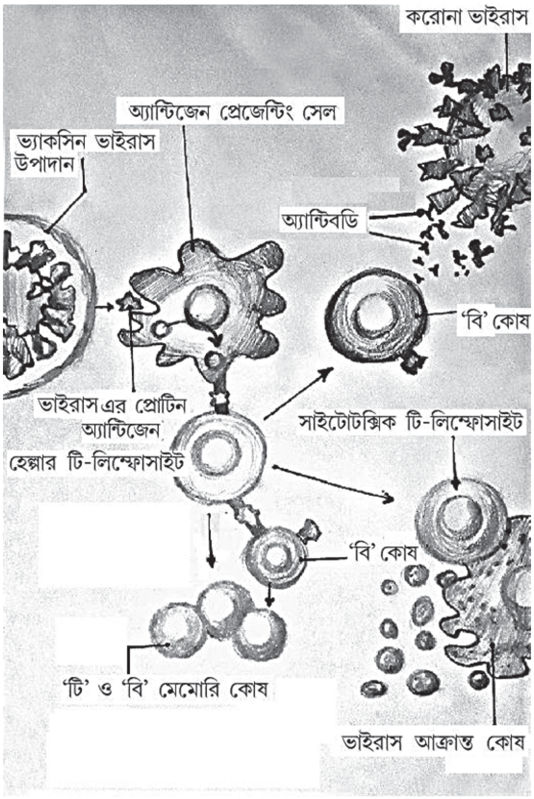

করোনা ভ্যাকসিন যেভাবে সুরক্ষা দেয়

করোনা গবেষণায় সাম্প্রতিক মাইলস্টোন-১

টিকা তৈরির দৌড়ে ব্রিটেন, আমেরিকা, চিন, জার্মানি, ভারত, ইসরায়েল, অস্ট্রেলিয়া—সবাইকে পেছনে ফেলে ১১ আগস্ট 'স্পুটনিক-ভি' নামের করোনা-রোধী ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশন করল রাশিয়া। এই অ্যাডিনো ভাইরাস বেস্‌ড ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন (পরিভাষায় রিকমবিন্যান্ট ভ্যাকসিন) নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা নিরাপত্তা নিয়ে যত না প্রশ্ন তার থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন নিয়ম না মেনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য। অনেকেই এর পেছনে রাজনীতি ও অর্থনীতির প্যাঁচ-পয়জার দেখতে পাচ্ছেন।

আসলে ফর্মুলার বিচারে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রোজেনেকার ভ্যাকসিন 'চ্যাডক্স-১' ও চিনের 'ক্যানসাইনো'-র সঙ্গে অনেকটাই মিল রাশিয়ার স্পুটনিক-এর। তিনটিই 'অ্যাডিনো ভাইরাস বেস্‌ড ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন।' এখানে অ্যাডিনো ভাইরাস একটি গাড়ির মত বহন করার কাজে লাগছে মাত্র। তার ভেতর করোনার স্পাইক প্রোটিনের জিন ঢুকিয়ে 'রিকমবিন্যান্ট' ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে। বংশবৃদ্ধির জন্য দায়ী অংশটি বাদ দেওয়ায় ভাইরাস শরীরে ঢুকে 'মাল্টিপ্লাই' করতে পারছে না। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে যতটা 'ভাইরাল অ্যান্টিজেন' ঢোকানো হবে, ততটুকুই থাকবে। কোষে ঢুকে অ্যাডিনো ভাইরাস তার ডিএনএ-টাকে নিউক্লিয়াসে ছেড়ে দেবে। ট্রান্সস্ক্রিপশন ও ট্রান্সলেশনের ফলে এটি স্পাইক প্রোটিন তৈরি করবে। তা দেখেই শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলো উত্তেজিত হবে ও কাজে নেমে পড়বে। এখানে আসল কাজটি করবে 'অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল'। এরা বাইরে থেকে শরীরে চলে আসা (আদতে শরীরে তৈরি হল) বড় স্পাইক প্রোটিনটিকে ভেঙে দেবে। তারপর টি-সেলকে বার্তা দেবে আসল কাজ করার জন্য। এই পুরো কাজটিকে বলে 'অ্যান্টিজেন প্রসেসিং অ্যান্ড' প্রেজেন্টেশন। নিঃসৃত হবে সাইটোকাইন। এতে অন্যান্য ইমিউন কোষগুলো উত্তেজিত হবে ও কাজ শুরু করবে। এদের মধ্যে বি ও টি লিম্ফোসাইট অন্যতম।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের দাবি 'স্পুটনিক ভি' দু বছর পর্যন্ত সুরক্ষা দেবে। অর্থাৎ স্পুটনিকের তৈরি করা 'টি' ও 'বি' মেমোরি কোষ দু বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে। 'স্পুটনিক নিউজ'-এ এমনি দাবি করা হয়েছে। যদিও দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণপত্র প্রকাশ্যে আনেনি রাশিয়া। ফলে বিশ্বের তাবড় ভাইরোলজিস্টদের সন্দেহের নিশানা হয়েছে দাবিটি। তাঁদের বক্তব্য, কিসের ভিত্তিতে এই দু বছরের সময়সীমার কথা বলা হচ্ছে? নিরীক্ষার মাধ্যমে অ্যান্টিবডির মাত্রা মাপা গেলেও আয়ু মাপা বেশ কঠিন। একটাই উপায়, দু বছর অপেক্ষা করা।

স্পুটনিক ভ্যাকসিনে অ্যাডিনো ভাইরাসের দু ধরনের 'সেরোটাইপ' ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাডিনো ভাইরাস ২৬ ও অ্যাডিনো ভাইরাস ৫। তিন সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি ডোজ দেওয়া হচ্ছে। গবেষকদের দাবি, তাতেই নাকি টি ও বি মেমোরি কোষ তৈরি হচ্ছে; যাদের জীবনকাল দু বছর। আসলে এই দাবির ভিত্তি অতীত অভিজ্ঞতা। ইবোলা, এইচআইভি, লিম্ফোসাইটিক কোরিও মেনিনজাইটিস ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে দুটি সেরোটাইপ ব্যবহার করে মেমোরি সেলের এরকম দু বছরের স্থায়ীত্বকাল পাওয়া গেছিল।

১৮ জুন স্পুটনিকের ট্রায়াল শুরু হয়। দুটি দলে ৩৮ জন করে মোট ৭৬ জনকে টিকা দেওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বের কয়েকটি দেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের হিউম্যান ট্রায়াল শুরুর তোড়জোড় চলছে।

করোনা গবেষণায় সাম্প্রতিক মাইলস্টোন-২

নাকে ড্রপ দিয়ে টিকাকরণ তেমন প্রচলিত নয়। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বা নিদেনপক্ষে মুখে ড্রপ দিয়ে টিকাকরণই দস্তুর। করোনা কি সেই প্রবণতাতেও বদল আনতে চলেছে? এমনই জল্পনা উস্কে দিয়েছে বিজ্ঞান পত্রিকা 'সেল' এবং 'নেচার কমিউনিকেশন'-এ সদ্য প্রকাশিত দুটি গবেষণাপত্র। দুটিতেই বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, করোনার প্রতিষেধক নাকে দিলেও 'সার্স-কোভ-২' ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা মিলেছে। একদল এগিয়ে, আরও গবেষক দেখিয়েছেন, বহুল প্রচলিত ইন্ট্রামাসকুলার অর্থাৎ পেশিতে দেওয়া ভ্যাকসিন-এর চেয়েও কার্যকর হচ্ছে ইন্ট্রান্যাজাল[২১] পদ্ধতি। এতে বেশি কাত হচ্ছে করোনা। সবচেয়ে বড় কথা, এই টিকা দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, নাসারন্ধ্রে বা শ্বাসতন্ত্রে ঢোকা মাত্রই ভাইরাসের নির্মূলন হচ্ছে।

মিসৌরির ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের দুই বিজ্ঞানী ডেভিড কুরিয়েল ও মাইকেল ডায়মন্ডের দল কাজ করেছেন বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে তৈরি ইঁদুরের ওপর, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের শরীরে থাকা রিসেপ্টর এসিই-২, যা করোনাকে কোষে ঢুকতে সাহায্য করে। রিসাস বাঁদরের ওপর পরীক্ষা করেছেন চিনের গুয়াংঝ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী লিনচেন ও তার সহযোগীরা।

মিসৌরির বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, পেশিতে টিকা দেওয়ার পর শরীর জুড়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা (সিস্টেমিক ইমিউনিটি) তৈরি হচ্ছে, ইমিউন কোষরা সঠিক কাজ করায় ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে। তবে শরীরে ঢোকা থেকে আটকানো যাচ্ছে না ভাইরাসকে। অর্থাৎ, তৈরি হচ্ছে না স্টেরিলাইজিং ইমিউনিটি। যা পাওয়া যাচ্ছে ইন্ট্রান্যাজাল পদ্ধতিতে। তৈরি হচ্ছে মিউকোসাল ইমিউনো গ্লোবিউলিন-এ অ্যান্টিবডি। এটি কাজ করছে ফ্রন্টলাইন ইমিউনিটি হিসাবে। অর্থাৎ প্রবেশদ্বারেই পাহারাদার। করোনা ঢুকলেই কাত। প্রথমক্ষেত্রে ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধের পরও ফুসফুসে কিছু ভাইরাল আরএনএ অবশিষ্ট হিসাবে থেকে যাচ্ছিল। ইন্ট্রান্যাজালে সাফ হয়ে যাচ্ছে পুরোটাই। এমনই দাবি

সারণী : টিকা তৈরির দৌড়ে এগিয়ে থাকা করোনা টিকাগুলির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

টিকার নাম, প্রস্তুতকারী সংস্থা ও দেশ	টিকা তৈরির পদ্ধতি/উপাদান	কীভাবে কাজ করে	বর্তমান অবস্থান
১) এ জেড ডি ১২২২ (চ্যাডক্স-১), কাভিশিল্ড (ভারতে); অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাস্ট্রোজেনেকা; ইংল্যান্ড	অ্যাডিনো ভাইরাস সম্বলিত রিকমবিন্যান্ট ভ্যাকসিন	অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং টি-কোষের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে	ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এর তৃতীয় পর্যায় চলছে
২) এ্যাড-৫ ক্যানসাইনো; ক্যানসাইনো বায়োলজিক্যালস্; চিন	অ্যাডিনো ভাইরাসের সেরোটাইপ-৫ সম্বলিত রিকমবিন্যান্ট ভ্যাকসিন	”	”
৩) স্পুটনিক-ভি; গামালেয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাশিয়া;	অ্যাডিনো ভাইরাসের সেরোটাইপ-৫ ও সেরোটাইপ-২৬ সম্বলিত রিকমবিন্যান্ট ভ্যাকসিন	অ্যান্টিবডি তৈরি করে। বি ও টি মেমরি কোষ তৈরিতে সাহায্য করে	ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করবে
৪) এমআর এনএ-১২৭৩; মডার্না; আমেরিকা	মডিফায়েড এমআরএমএ সম্বলিত লিপিড ন্যানোপার্টিক্যাল	অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং টি-কোষের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে	ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এর তৃতীয় পর্যায় চলছে
৫) এমআরএনএ; বায়োএনটেক, ফাইজার ও ফোসাম ফার্মা; জার্মানি	”	”	”
৬) কোভ্যাক্সিন; ভারত বায়োটেক; ভারত	ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন	অ্যান্টিবডি তৈরি করে	ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এর দ্বিতীয় পর্যায় চলছে
৭) সাইনোভ্যাক; সাইনোভ্যাক বায়োটেক; চিন	”	”	ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এর তৃতীয় পর্যায় চলছে
৮) সাইনোফার্ম ভ্যাকসিন-১; ইনোফার্ম ও উহান ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস; চিন	”	”	”
৯) সাইনোফার্ম ভ্যাকসিন-২; সাইনোফার্ম ও বেজিং ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস; চিন	”	”	”
১০) জাইকোভ-ডি; জাইডাস ক্যাডিলা; ভারত	ডিএনএ ভ্যাকসিন	অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং টি-কোষের কার্যকারিতা বাড়ায়	ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এর দ্বিতীয় পর্যায় চলছে
১১) সাব-ইউনিট ভ্যাকসিন; চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স; চিন	প্রোটিন সাব-ইউনিট ভ্যাকসিন (রিকমবিন্যান্ট ডি-ডাইমার)	”	”
১২) নোভাভ্যাক্স ভ্যাকসিন (এনভিএক্স ২৩৭৩); নোভাভ্যাক্স; চিন	প্রোটিন সাব-ইউনিট ভ্যাকসিন (রিকমবিন্যান্ট স্পাইক প্রোটিন)	”	”

বিজ্ঞানীদের। চিনের বিজ্ঞানীদের গবেষণাতেও দেখা যাচ্ছে, টিকা কার্যকর। তবে নাকে প্রয়োগ করলে গোটা শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে কিছুটা কম।

করোনা গবেষণায় সাম্প্রতিক মাইলস্টোন-৩

সম্প্রতি করোনা জয়ীদের শরীরে নতুন এন-কে সেল'-এর হদিশ মিলল গবেষণায়। শুধু টি-সেল, বি-সেল নয়, শরীরে অর্জিত এক ধরনের কোষ 'ন্যাচারাল কিলার সেল' ও করোনা মোকাবিলায় 'গেমচেঞ্জার' হয়ে উঠছে। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের গবেষণায় এমনই তথ্য উঠে এল।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি বড় অংশ সামলায় 'লিম্ফোসাইট' নামক শ্বেত রক্তকণিকা। সেই পরিবারের আর এক সদস্য এন-কে বা 'ন্যাচারাল কিলার সেল', যাকে লার্জ গ্র্যানুলার লিম্ফোসাইট'ও বলা হয়। এই এন-কে সেল মূলত সহজাত বা বংশগত। কার শরীরে কতটা এন-কে সেল মজুত থাকবে তা তার শারীরিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল। এন-কে ছাড়াও সহজাত প্রতিরোধী ব্যবস্থার অন্য সদস্যরা হল নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফাজের মত কোষ এবং লাইসোজাইম, সি-রিঅ্যাক্টিভ। প্রোটিন ইন্টারফেরন-এর মত কিছু জৈব অণু।

অ্যাডাপ্টিভ বা অধীত ইমিউনিটির সবচেয়ে বড় অস্ত্র টি ও বি লিম্ফোসাইট কোষ এবং অ্যান্টিবডি জৈবাণু। করোনা প্রতিরোধে এই অস্ত্রগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছিল। এবার এই তালিকায় ঢুকে পড়ল এক ধরনের এন-কে সেল, যা শরীর বয়স বাড়ার সঙ্গে অর্জন করেছে। অর্থাৎ, অ্যাডাপ্টিভ এন-কে' সেল। ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের গবেষকরা করোনা জয়ীদের দেহে এই নতুন ধরনের এন-কে সেল খুঁজে পেয়েছেন, যা সম্প্রতি 'সায়েন্স ইমিউনোলজি' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষকরা জানতে পেরেছেন, কোন রোগী কোভিড আক্রান্ত হবেন, তিনি উপসর্গযুক্ত হবেন, না হবেন না, তা অনেকটাই রয়েছে এই নতুন আবিষ্কৃত এন-কে সেলের হাতে। টি-সেলের সঙ্গে জোট বেঁধে এরা করোনা আক্রান্ত কোষগুলোকে মারছে। গবেষকদের পর্যবেক্ষণ, যাঁদের শরীরে এই অধীত এন-কে সেল রয়েছে, তারা সহজেই কোভিডের মোকাবিলা করতে পারছেন। সাধারণতঃ পারফোরিন, গ্র্যানজাইম, এন-কে লাইসিন নামক 'টক্সিক মেটাবলাইট' বা বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করে এন-কে সেল ভাইরাস আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে। দেখা গেছে, সুষম খাবার খেলে ও ব্যায়াম করলে অন্যান্য ইমিউন কোষের মত এন-কে সেল-এরও সক্রিয়তা বাড়ে। ফলে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথাযথভাবে কাজ করে।

email:joardar69@gmail.com • M. 9231533335

পাদটীকা

১) **ন্যানোমিটার** — ১ মিলিমিটারের ১০০০ ভাগের ১ ভাগকে ১ মাইক্রণ বলে। ১ মাইক্রণের ১০০০ ভাগের ১ ভাগকে ১ ন্যানোমিটার বলে। ১ ন্যানোমিটার = ১০$^{-৬}$ মিলিমিটার।
২) **মিউটেশন** — কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডিএনএ-র অণুর অংশ (পরিভাষায় জিন)-এর স্থায়ী পরিবর্তন।
৩) **রিসেপ্টর** — কোষের বাইরে বেরিয়ে থাকা জৈব-অণু, যা ভাইরাস-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
৪) **লিগাণ্ড** — ভাইরাসের বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা যে অংশ কোষের গ্রাহক (রিসেপ্টর)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।
৫) **বায়ো-সেফটি লেভেল ফোর বীক্ষণাগার** — অত্যধিক সংক্রামক জীবাণু ও ভাইরাসের ওপর গবেষণার কাজে নির্মিত একটি সুরক্ষিত বীক্ষণাগার যেখানে বায়ু নিয়ন্ত্রক বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকে।
৬) **এণ্ডোথেলিয়াল কোষস্তর** — রক্তবাহনালীর ভিতরের দিকের কোষস্তর।
৭) **এপিথেলিয়াল কোষ** — শরীরের কোনও অঙ্গের বাইরের আচ্ছাদিত কোষ।
৮) **সাইটোকাইন** — কোষ নিঃসৃত প্রোটিন জৈব-অণু।
৯) **অ্যাকুট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম** — হঠাৎ করে তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যা।
১০) **ক্লাসিক সিস ও ট্রান্স পদ্ধতি** — সরাসরি কোষীয় বার্তা বহন পদ্ধতিকে ক্লাসিক সিস ও অন্য জৈবাণুর সাহায্য নিয়ে বার্তাবহনকে ট্রান্স পদ্ধতি বলা হয়।
১১) **সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম** — কোষ নিঃসৃত জৈব-অণু (সাইটোকাইন) নির্গত হবার ফলে উদ্ভূত শারীরিক অসুবিধা।
১২) **নেক্রোসিস** — কোষ মৃত্যু।
১৩) **হার্ড ইমিউনিটি** — টিকা প্রদানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর যূথ প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি করা।
১৪) **মেমরি কোষ** — একপ্রকার লিম্ফোসাইট যা ভবিষ্যতে জীবাণুকে চেনা ও লড়াই-এর কাজে লাগবে বলে শরীরে সঞ্চিত রাখা হয়।
১৫) **অ্যান্টিবডি** — প্রোটিন জৈব-অণু যা শরীরের বাইরের শত্রু (জীবাণুর অ্যান্টিজেনের) বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়।
১৫ক) **অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি** — দেহের রোগ প্রতিরক্ষাতন্ত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
১৫খ) **প্রিসিম্পটোম্যাটিক ট্রান্সমিশন** — রোগের উপসর্গ প্রকাশের পূর্বাবস্থায় রোগের বিস্তার।
১৬) **কন্টাক্ট ট্রেসিং** — করোনা আক্রান্তকে খুঁজে বের করা।
১৭) **লেসার বীম** — এক বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপন্ন আলোকরশ্মি।
১৮) **রেপ্লিকেশন** — সংখ্যায় বেড়ে অপত্য তৈরি করা।
১৯) **হাইড্রোফিলিক** — জল শোষণ করতে পারে এমন বস্তু।
২০) **অ্যান্টিজেন** — জীবাণু বা ভাইরাসের শরীরের প্রোটিন অণু যা আমাদের শরীরে প্রতিরোধী ব্যবস্থাকে উদ্যত করে।
২১) **ইন্ট্রান্যাজাল নাসারন্ধ্রে প্রযুক্ত।**

বিশেষ টীকা

ক) **প্যানডেমিক** — দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে মহাদেশে (বহু জনগোষ্ঠীকে) ছড়িয়ে পড়া সংক্রামক রোগ।
খ) **এন্ডেমিক** — নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একই সংক্রামক রোগের পুনঃসংক্রমণ। অর্থাৎ এটি আঞ্চলিক (স্থানীয় রোগ)
গ) **এপিডেমিক** — বহুস্থানীক ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সংক্রামক রোগ, যা মহামারী বলে পরিচিত।

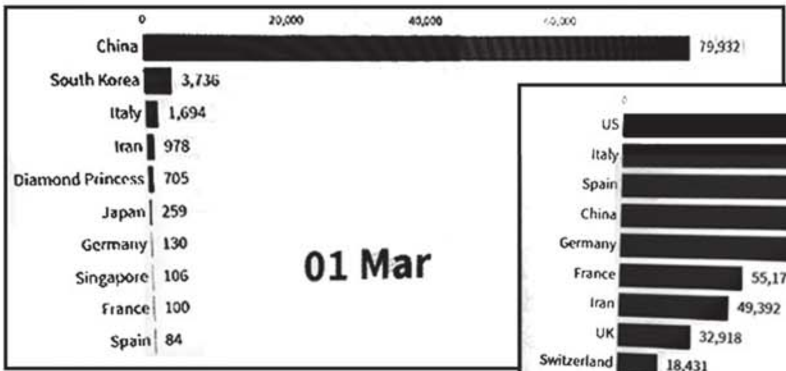

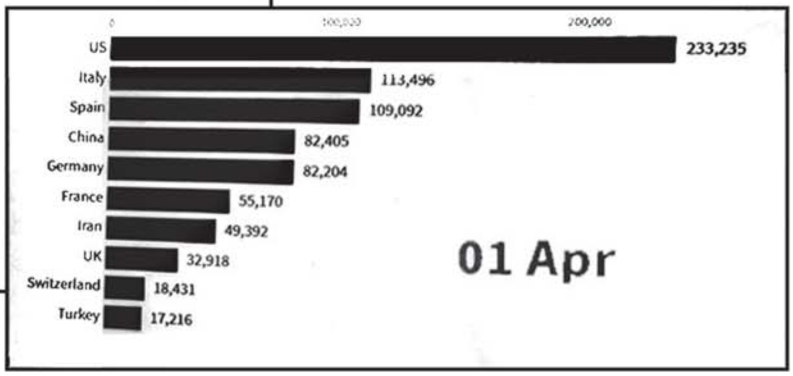

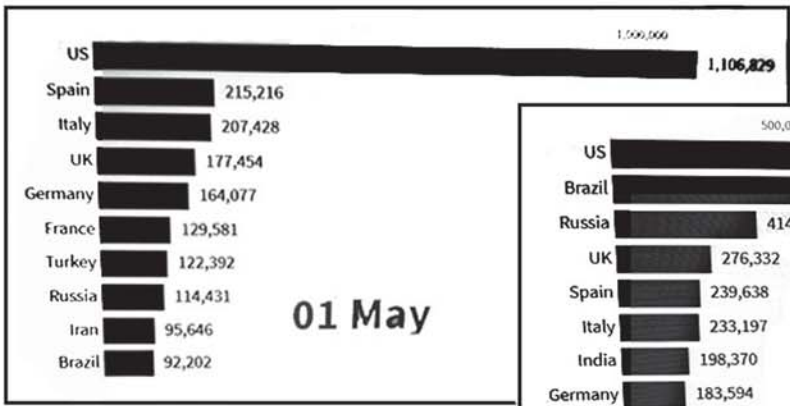

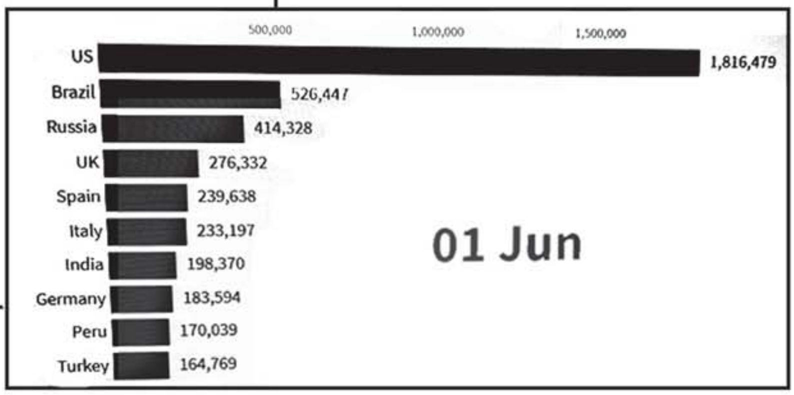

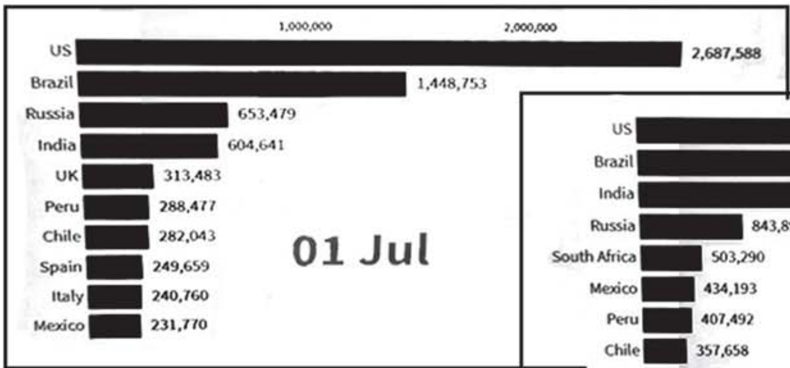

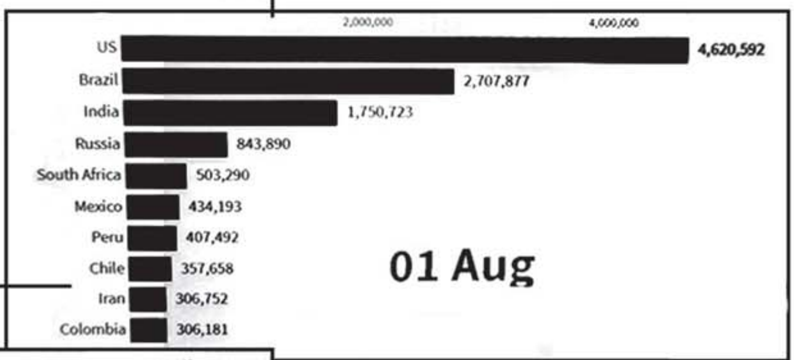

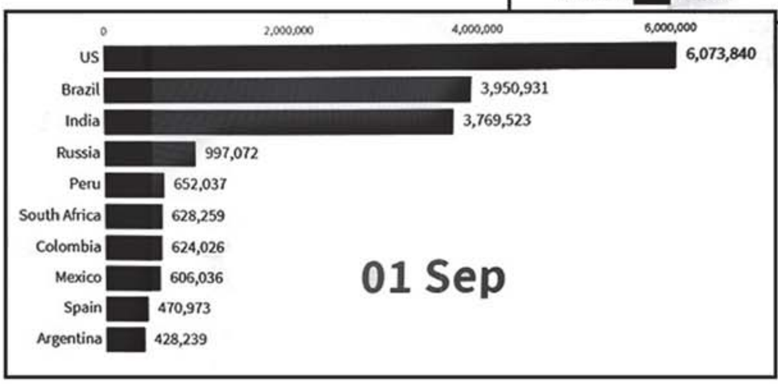

সাংখ্যচিত্রে
দেশে দেশে মাসে মাসে
করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তৃতি
সূত্র : জন্‌স হপকিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়

সুকল্যাণ গাইন

মহামারী-অতিমারি : বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

‘পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে...’ —*সুকান্ত ভট্টাচার্য*

প্লেগ রোগীরা হাসপাতালে ঠাঁই পেতেন না। রাস্তায় পড়ে থাকতেন।

মহামারী ইতিহাসের গতিপথকে পরিবর্তন করেছে। আবার এই মহামারী যখন অতিমারির আকার ধারণ করেছে তখন তার কবলে ধ্বংস হয়েছে একাধিক সভ্যতা। যার প্রারম্ভিক পর্বের সূত্রপাত হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক সময়ে। সেই ধারা আজও অব্যাহত। বর্তমানে পৃথিবীময় সংক্রামক রোগের জন্য মানবসমাজ যে সংকটের সম্মুখীন, তার থেকে মুক্তি আজও সবার কাছে অজানা। সময়ের সাথে সাথে এই মারণরোগ অনেকের জীবন গ্রাস করছে। অন্যদিকে যাদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ হয়নি তারা অনেকেই মনের রোগের কাছে হার মানছে। এইসবের পরেও তারা বাঁচতে চায়, তারা স্বপ্ন দেখে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিনিয়ত নিজের মনকে বলে—‘আমরা করব জয়! একদিন’। কারণ বিজ্ঞানের উপর তাদের আস্থা যে আজও বিদ্যমান।

মানবজীবনের সাথে মহামারীর যোগ সেই প্রাচীনকাল থেকেই। ইতিহাস ও সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। অতিমারি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী তৎকালীন বাংলার সাহিত্যিকদের রচনাতে প্রভাব ফেলেছিল। সাহিত্যিকরা সমাজের সার্বিক অবস্থার চিত্রকে লেখনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন। দুর্ভিক্ষের কথা যখন বলা হল তখন ১১৭৬ বঙ্গাব্দ-এর (১৭৭০ সাল) ঘটনার কথা সবার আগে মনে পড়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ‘দ্য অ্যানালগ অব রুরাল বেঙ্গল’ বইতে হান্টার এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল দুর্ভিক্ষের ১০০ বছর পর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি লেখার সময় হান্টারের এই বইটি থেকে বেশ কিছু তথ্যের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই উপন্যাসে যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, শাসন কাঠামোতে দ্বৈরাজ্যনীতি, ওয়ারেন হেস্টিং কর্তৃক দমননীতি ইত্যাদির ইতিহাস যেমন আলোচিত করেছেন, তেমনই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও মন্বন্তর কালের চিত্র তুলে ধরছেন সাহিত্য সম্রাট। উপন্যাসের প্রারম্ভিক অংশটি যদি দেখা যায় তাহলে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অনেকটাই স্পষ্ট হবে—“১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ। মধ্যে মধ্যে উচ্চ-নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পালাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে। দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে। অধ্যাপক

টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না। বৃক্ষে পক্ষী দেখি না। গোচারণে গরু দেখি না। কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুকুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই-বা কী, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।"

দুর্ভিক্ষে অসহায় শিশু

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কবিগুরু তৎকালীন সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে আস্তিকতা-নাস্তিকতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পরলৌকিকতা-ইহজাগতিকতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার উল্লেখ রয়েছে। এই উপন্যাসে জ্যাঠামশাই জগমোহন ছিলেন নাস্তিক। কেন? প্রমাণ মেলে তার ভাইপো শচীশ ও বিলাস-কে বলা এই কথাতে—"যদি শ্রাদ্ধ করার শখ থাকে তাহলে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।" এই জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন প্লেগ রোগে। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের উদ্যোগে একটি হাসপাতাল খুলেছিলেন প্লেগ রোগের চিকিৎসার জন্য। আজ বর্তমানে করোনা আক্রান্তদের যেভাবে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। ঠিক তেমনই অবস্থা দেখা গিয়েছিল সেই সময়তেও। তখন প্লেগ হলে সেই রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি নিত না। এমনকী পাড়ার কেউ ডাক্তার ডাকত না এই ভয়ে যদি তারও সেই রোগ হয়। সেই কারণেই জগমোহন হাসপাতাল খুলেছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁরই মৃত্যু হয় এই রোগে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর রচনাতেও মহামারির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কলেরার উল্লেখ আছে। বৃন্দাবন দেখেছিলেন যে পুকুরের জল সবাই পান করত, সেই পুকুরের জলে কলেরা রোগীদের বস্ত্র ধোয়া হত। সেই জল পান করার ফলে

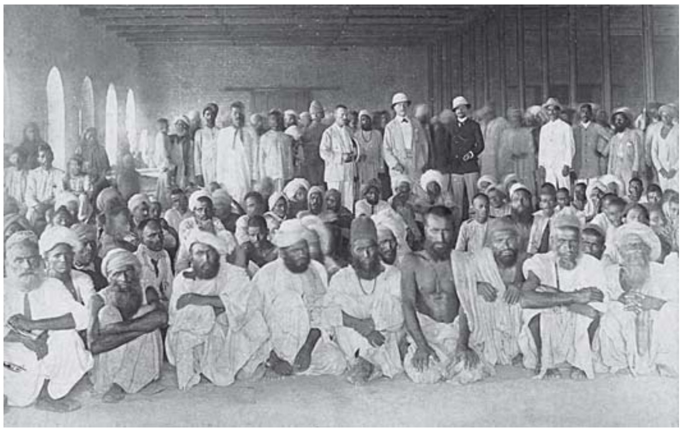

১৪৯৭-এ করাচিতে বিউবনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাবে কোয়ারেনটাইন অঞ্চল

কিছুদিনের মধ্যে গ্রামে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবন নিজের চেষ্টায় গ্রামে বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করলেও তার মা এবং ছেলে চরণ-কে বাঁচাতে পারেননি। এই কলেরা তাদের জীবন কেড়ে নেয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সাথে Quarantine শব্দটি যেভাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও এই শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। শ্রীকান্ত যেইদিন রেঙ্গুনে আসলেন সেইদিন তিনি চারিদিকে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক লক্ষ করেন। বাইরে থেকে কোনো মানুষ আসলে আজ যেমন তাদের প্রথমেই Quarantine-এ পাঠানো হত। উপন্যাসে একটি অংশে যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে—"পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছবে, কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখে দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম কথাটা Quarantine; তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং port health officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা। শ্রীকান্ত ও পণ্ডিতমশাই উপন্যাস ছাড়াও 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে কলেরা এবং 'গৃহদাহ' উপন্যাসে যেখানে অচলা, মহিম ও সুরেশ-এর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত আছে, তেমনই উপন্যাসে শেষে দেখা যায় সুরেশ তার জীবন প্লেগ রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে।

দুর্ভিক্ষ বা মহামারির কথা প্রসঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনে আর একটি বিষয় জড়িত আছে, যার থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। বলছি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস-এর কথা। কেন বলছি? খোঁজ নিয়ে দেখবেন আজও অনেক জায়গায় যদি কারোর জ্বর, সর্দি, কাশি বা অন্যান্য কোন রোগ হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে তারা বেশি গুরুত্ব দেন তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক-কে। কাউকে সাপে কাটলে

সেই রোগীতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে অ্যান্টি ভেনম সিরাম দেওয়ার বদলে নিয়ে যাওয়া হয় ওঝার কাছে। মানুষ আজও নিজের ভাগ্যবিচার করতে ভরসা রাখেন জ্যোতিষীদের উপর। কিছু সংখ্যক মানুষ চেষ্টা করে যান এই কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। যে কাজটি করার চেষ্টা করেছিল শশী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-তে শশী ছিলেন একজন ডাক্তার। সে গাওদিয়া গ্রামের মানুষদের পাশে থাকত চেয়েছিল। কারণ, জ্বর, কলেরা, টাইফয়েড-এর ফলে গ্রামের মানুষ অনেকেই মারা যাচ্ছিল। তাই সে গ্রামের মানুষদের বাঁচানোর জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। অনেকজনকে সে সুস্থ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার একার পক্ষে সবাইকে ঠিক করাও সম্ভব ছিল না। এই চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখল কোথাও যেন এক অদৃশ্য শক্তির মায়াজালে মানুষ নিমজ্জিত। সেই শক্তি ছিল মূলত কুসংস্কারের।

তবে এর বাইরেও কিছু মানুষ আছেন যারা এই কুসংস্কারের বাইরে থেকে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন অন্যদের সেবায়। 'কোদালি ব্রিগেড'-দের কথা বলতে হয়। যারা গ্রামকে বাঁচাতে বিশুদ্ধ জলের জন্য কোদাল দিয়ে গভীর কুয়ো খুঁড়েছিল। কারণ গ্রামের মানুষ কলেরাতে আক্রান্ত। বলছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের কথা। যেখানে উল্লেখ রয়েছে নবীনদের সাথে প্রবীণদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব ছিল মূলত চিকিৎসা, রোগ, রোগী কেন্দ্রিক। দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল শিবনাথকেও। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিল। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র, দেশপ্রেমের শিক্ষা, কলকাতায় পড়তে গিয়ে বিপ্লবী সংস্পর্শ ইত্যাদি তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সে ঠিক করেছিল নিজের গ্রামের মানুষদের সেবা করবে, তাদের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু আদতে তাকেই প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হতে হয়েছিল। গ্রামের অস্পৃশ্য কলেরা রোগীদের সেবা করতে গিয়ে তাকে উচ্চবিত্তদের রোষে পড়তে হয়। অনেকটা একই রকম ঘটনা ঘটেছিল শিবনাথের সাথেও। সেও একভাবেই কলেরা আক্রান্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে সংক্ষেপে মহামারী, দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ যখন উল্লেখ করা হল তখন ইতিহাসে মহামারী ঘটনাগুলো বাদ যায় কেন। মহামারীর ইতিহাস জানতে গেলে প্রথমে চোখ রাখতে হয় থুকিডিডিস-এর লেখা 'হিস্ট্রি অব দ্য পেলোপলেসিয়ান ওয়ার' বইটির উপর। ৪৩০-৪২৬ খ্রি. পূ. এই সময়কালে গ্রীক ও স্পার্টানদের মধ্যে পেলোপনেসির যুদ্ধ চলাকালীন দেখা যায় সৈন্যরা এক অজানা রোগে মারা যাচ্ছেন। পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে থুকিডিডিস তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন এথেন্সে এই সময় সৈন্যদের মধ্যে অনেকের ত্বক কালো হতে থাকে যার ফলে পোশাক পড়তেও তাদের সমস্যা হত। শরীরে এতটাই জ্বালা ধরত যে তার জন্য তারা সারাদিন ঠান্ডা জলে ডুবে থাকত। এই রোগের বড় অংশের ব্যাখ্যা থুকিডিডিস-এর রচনাতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে এই রোগকে প্লেগ বলা নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। কারণে অনেকে মনে করেন এই রোগটি হয়েছিল গুটিবসন্ত, টাইফয়েড, হাম ইত্যাদি থেকে। এথেন্সের পর আর একটি বড় রোগ দেখা দিয়েছিল রোমে। রোগটি অ্যান্টোনাইল

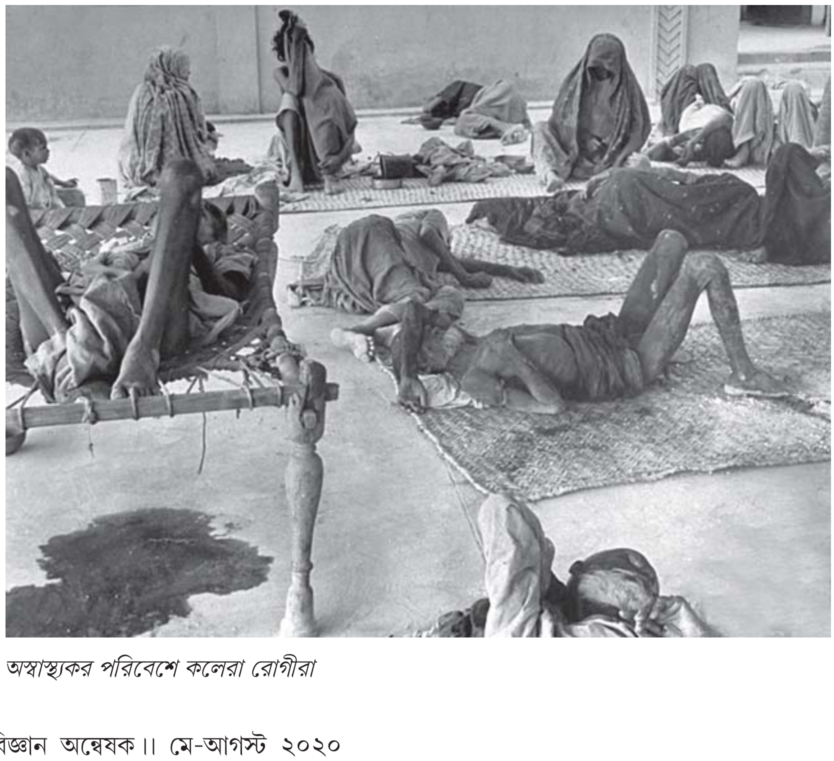

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কলেরা রোগীরা

প্লেগ নামে পরিচিত ছিল। ১৬৫ খ্রি. এই রোগ চিনে দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে পশ্চিমে গিয়ে রোমে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীক চিকিৎসক গ্যালনের লেখা 'মেথোডাস মেডেন্ডি'-তে এর বর্ণনা আছে। রোমের সামরিক বাহিনী যখন টাইগ্রিস নদীর নিকটে সেলিউসিয়া নামক শহর অবরোধ করে তখন তার কিছু সময়ের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়। সময়কাল ছিল ১৬৫ খ্রি./১৮০ খ্রি.। এই রোগের লক্ষণ ছিল জ্বর, ডাইরিয়া, গলা ফুলে যাওয়া, বমি ইত্যাদি। ইথিওপিয়াতে ২৫০ খ্রি. নাগাদ একটি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে—যা পরবর্তী সময়ে রোম, গ্রীস, সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রোগটি এক দশকের বেশি সময় ধরে দেখা দিয়েছিল। যাদের এই রোগ হয়েছিল তাদের বধিরতা, অন্ধত্ব, পক্ষাঘাত, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গগুলো দেখা দিয়েছিল।

সম্রাট জাস্টিয়ান যখন রোমান সাম্রাজ্য বাইজানটাইনকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তখন রোগটি মিশর সহ বাইজেনটাইন হয়ে প্যালেস্তাইন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। রোগটি ছিল জাস্টিনিয়ার প্লেগ। যার প্রকোপ সবথেকে বেশি ছিল ৫৪১-৫৪২ খ্রি. সময়কালে। এই প্লেগ সংক্রমণের মাধ্যম ছিল ইঁদুর। যদিও এই প্লেগের নাম ছিল

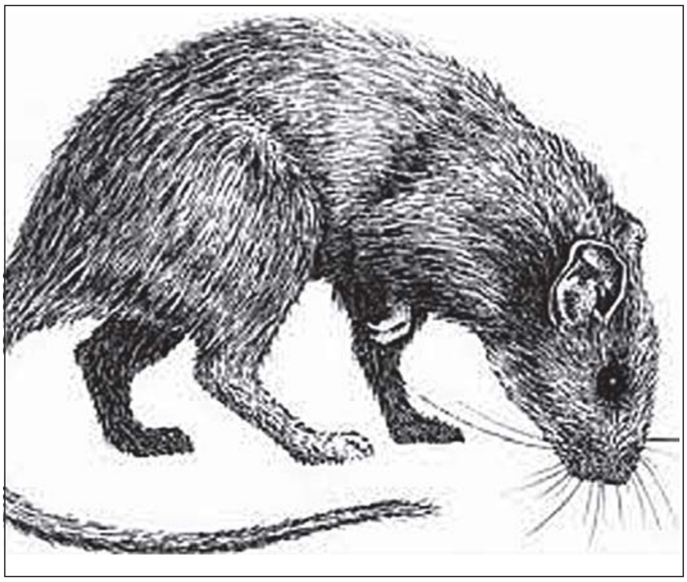

বুবোনিক। এই প্লেগের ফলে কয়েক কোটি মানুষ মারা যায়। বাইজেনটাইন সহ একাধিক শহরের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে যায়। ৭৩৫-৭৩৭ খ্রি. সময়কালে জাপানে ঘটে যাওয়া মহামারীতে প্রচুর মানুষ মারা যায়। এই মহামারীর কারণ ছিল গুটিবসন্ত। রোগটি প্রথমে দেখা দিয়েছিল জাপানের কিউশু দ্বীপে যা পরবর্তীকালে জাপানের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৩৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে চিন, ভারত, পার্সিয়া, সিরিয়াতে মহামারী দেখা দেয়। যা পরবর্তী সময়ে অতিমারির আকার নিয়েছিল। ইতিহাসে এটি ব্ল্যাক ডেথ নামে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণসাগরের উপর দিয়ে ১২টি জাহাজ যখন মেসিনার সিসিলি বন্দরে যাত্রা করেছিল তখন গোটা ইউরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। কারণ জাহাজগুলো ইঁদুরের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ইঁদুর-ই ছিল এই রোগের মূল বাহক। জাহাজের নাবিকরা মারা যায় এবং যারা বেঁচে ছিল তারাও অসুস্থ হয়ে পরে। তাদের মাধ্যমেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩৫০ খ্রি. নাগাদ এই রোগ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও বাল্টিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহামারীতে মূলত তিন ধরনের প্লেগ উপস্থিত ছিল। একটি হল বুবোনিক প্লেগ। অন্য দুটি ছিল নিউমোনিক ও সেপটিসেমিক। যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের জ্বর এবং ফোঁড়া দেখা যায়। পরবর্তীতে ত্বক কালো হতে থাকে, অনেকের রক্তবমিও হয়। সমগ্র ইউরোপ প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়। ১৩৯০ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৮০-১০০ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এই মহামারি জীবনধারাকে একেবারে বদলে দিয়েছিল। মহামারীর এতটাই প্রকোপ ছিল যার কারণে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধও থেমে গিয়েছিল।

স্প্যানিশ হার্নান কর্টেস মেক্সিকো অভ্যন্তরে অ্যাজটেক সভ্যতায় উননিবেশ স্থাপনের জন্য ১৫১৯ সালে কিউবা থেকে যাত্রা করেছিলেন। এই সময়ে একজন আফ্রিকান দাস-এর স্মল পক্স দেখা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যে কারণে অল্পকিছুদিনের মধ্যে গোটা অ্যাজটেক সাম্রাজ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্ল্যাক ডেথের পর বড় ধরনের মহামারি হয়েছিল ইতালিতে। ১৬২৯-১৬৩১ পর্যন্ত চলা এই প্লেগকে ইতালিয়া প্লেগ বলা হয়। ইতালিয়ান সৈন্যরা তিরিশ বছরের যুদ্ধের সময়ে যখন মান্টুরায় ছিল তখন এই রোগের প্রকোপ আরও বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে এই রোগ ভেরোনা, মিলান, ভেনিস সহ অন্যান্য শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও ইতালিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সৈন্যদের পৃথকীকরণ করা হয়েছিল এবং তাদের পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক দশক পর লন্ডনে আবার প্লেগ রোগ দেখা দেয়। যার সবথেকে বড় প্রকোপ লক্ষ করা গিয়েছিল ১৬৬৫-১৬৬৬-এর সময়কালে। লন্ডনের ১৫-২০ শতাংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন হয়ে যায়। ইউরোপে শেষবারের মত বৃহৎ আকারে প্লেগ দেখা দিয়েছিল ১৭২০ সালে। গ্রেট প্লেগ অব মার্সেই নামে পরিচিত এই মহামারীতে কেবল মার্সেইতেই এক লক্ষের বেশি মানুষ মারা যায়। মার্সেইতে গ্র্যান্ড সেন্ট এন্টাইন নামক একটি জাহাজ যখন পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়েছিল তখন থেকে এই রোগ দেখা দিয়েছিল। প্রথমে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল জাহাজের কয়েকজন। সেই জাহাজটিকে মার্সেইতে নোঙর ফেলতে দেওয়া হলে ধীরে ধীরে সেই রোগ ছড়িয়ে পরে। ১৭৭০ সাল নাগাদ রাশিয়াতেও প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল যার কবলে পরে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।

প্লেগ রোগের পর উনিশ শতকে শুরু হয় কলেরার প্রকোপ। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ভারত সহ অন্যান্য দেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এটি একটি সংক্রামক রোগ যা ভিব্রিও কলেরি নামক একটি জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট। এটি সাধারণত জলের মধ্যেই থাকে এবং সেই জলেই রোগটি ক্রমশ ছড়িয়ে পরে। ১৮১৭ সাল নাগাদ ভারতে প্রথম কলেরা দেখা দিলে ধীরে ধীরে ইউরোপীয়দের বাণিজ্য পথ ধরে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া হয়ে ইউরোপে দেখা দেয়। দ্বিতীয়বারের মত প্রকোপ বেড়েছিল ১৮২৯

১৯১৪ : স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত রোগীরা

সালে। ১৮২৯-১৮৩২ সালের মধ্যে এই রোগ ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি সহ একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে পরে। আমেরিকাও এ রোগের কবল থেকে বাদ যায়নি। ১৮৫২-১৮৫৯ তৃতীয় পর্যায়ে এই রোগ উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপের একাধিক জায়গায় দেখা যায়। যার কবলে পরে কেবল ব্রিটেনে ১৮৫৮ সালে প্রায় ২৫০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে কলেরা দেখা যায় ১৮৬৩-১৮৭৫ এবং ১৮৮১-১৮৯৬। ভারত সহ আফ্রিকা, চিন, জাপান, ইতালি, লন্ডন, জার্মানি, আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশগুলোতে কলেরার প্রকোপে প্রায় দেড় থেকে দু কোটি মানুষ মারা যায়।

১৯১৪-১৯১৮ পর্যন্ত চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সমগ্র বিশ্বের জনগণের অপরিচিত ছিল না। কিন্তু ফল যে মারাত্মক হয়েছিল সেটা ক'জন ভেবেছিলেন। দেখা দিল অতিমারি, যার নাম স্প্যানিশ ফ্লু। কিন্তু এর উদ্ভব কোথা থেকে হল সেটা কেউ স্পষ্ট ভাবে বলতে পারল না। অনেকে মনে করেন এর উৎপত্তি হয়েছিল চিন-এ, কেউবা মনে করেন এটির সর্বপ্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকাতে। স্প্যানিশ ফ্লু বলার একমাত্র কারণ এই রোগের প্রসঙ্গটি স্পেনের মিডিয়াতে প্রথম দেখানো হয়েছিল। H1N1 ভাইরাসটি জিনগত পরিবর্তনের কারণে আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যুদ্ধের শেষে যখন সেনারা বাড়ি ফিরত তখন অনেকেরই শরীরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কারোর জ্বর, কারোর বা শ্বাসকষ্ট। কারোর বা নাক মুখ থেকে রক্ত বার হতে লাগল। ধীরে ধীরে রোগ অতিমারির আকার নিয়েছিল। বিশ্ব জুড়ে আক্রান্ত হয়েছিল ৫০ কোটি মানুষ। মারা গিয়েছিল প্রায় ৫ কোটি। আফ্রিকাতে মৃত্যুর হার ছিল সবথেকে বেশি। জাম্বিয়াতে প্রায় ২২ শতাংশ মানুষ এই রোগের কারণে মারা যায়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই চিনে দেখা দিল এশিয়ান ফ্লু। ১৯৫৭-১৯৫৮ সাল নাগাদ দেখা দিল H2N2 ভাইরাস। এই ভাইরাসটি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস, এইচ ২ হিমাগ্লুটিনিন এবং এন ২ নিউরামিনাইডেজ এই তিনটি জিনের সমন্বয়ে তৈরি। ১৯৫৭ সালে প্রথমে সিঙ্গাপুর, হংকং হয়ে আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বজুড়ে মারা গিয়েছিল প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ।

বিশ শতকের আশির দশকে যে ভয়াবহ মহামারি দেখা দিয়েছিল তার থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম, সংক্ষেপে এইডস। এটি এমন একটি মারণরোগ যা মানব শরীরে প্রতিরোধকারী টি সেল বা সিডি ৪ কোষকে ধ্বংস করে দেয়। যার ফলে জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়। গবেষকরা মনে করেন আফ্রিকার কিনসাসাতে ১৯২০ সালের দিকে প্রথম এই রোগের সন্ধান মেলে। পরবর্তী সময়ে হাইতি ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৭০-১৯৮০ দশকে দেখা যায় অনেকেই ক্যান্সার বা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছেন। মারাও যাচ্ছেন অনেকে। ঠিক কি কারণে তারা মারা যাচ্ছেন তার কারণও জানতে পারছেন না। মহামারীর আকার ধারণ করল ১৯৮১ সালে যখন দেখা গেল অনেক সমকামী মানুষরা এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ১৯৮১ সালে আমেরিকাতে ৫ জন পুরুষের মধ্যে নিউমোসিসটিস নিউমোনিয়া নামক ফুসফুস সংক্রমণের ঘটনা পাওয়া গেছে। এক বছরের মাথায় এই রোগের প্রায় ৩৫০ জন আক্রান্ত হয়েছিল যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১৫০ জনের। ১৯৮৩ পর্যন্ত অনেকে এই রোগকে সমকামীদের রোগ বলেই মনে করত। ১৯৮৪ সালে অবশেষে এই রোগের কারণ শনাক্ত করতে

স্প্যানিশ ফ্লু আক্রান্তদের সেবিকারা

পেরেছিলেন। এবং ১৯৮৫ সালে এইচ আই ভি-র জন্য বাণিজ্যিক ভাবে রক্ত পরীক্ষার লাইসেন্স করেছিলেন। দেখা গেল ঐ বছর প্রায় ২০ লক্ষের বেশি মানুষ আক্রান্ত। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে জুডোভুডিন নামক একটি ওষুধ বাজারে আসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মারা গেছে ৩২০ লক্ষ।

মহামারীর ধারা একুশ শতকেও অব্যাহত। প্রাণীদের নিয়ে কাজ করতে করতে চিনের একটি ল্যাব থেকে ২০০৩ সালে সার্স ভাইরাস ছড়িয়েছিল। ২০০৭ সালে চিকুনগুনিয়ার ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায়। ইয়োলো ফিভার ধরা পরে ২০১১ সাল নাগাদ। ২০১১ সালে বহু মানুষ মৃত্যুর কারণ ছিল মেনিনজাইটিস। জিকা (২০১৫), জাপানিস এনসেফালাইটিস (২০১৭), ইবোলা (২০১৮) ইত্যাদি ভাইরাস কেড়েছে বহু মানুষের প্রাণ। সবশেষে কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস। মানব জীবনে যার দৌরাত্ম্য ক্রমবর্দ্ধমান। তবে নিশ্চিত বিজ্ঞানের কাছে হার মানবে এই ভাইরাস। বিশ্বাস করি হাতে হাত রেখে আবার নতুন ভাবে পথ চলার খোঁজ পাব আমরা। সে খোঁজের কথা সাম্প্রতিককালে সহস্র সুমনের লেখায় পরিস্ফুট—

"এ যাত্রায় বেঁচে গেলে, ভীষণ করে বাঁচব
সবাইকে জড়িয়ে ধরে অনেক করে কাঁদব।
এ যাত্রায় রেহাই যদি পাই, অন্যের কথা ভাবব"...

email:sukalyangain1@gmail.com • M. 9831688465

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা M. 9143157015 • বামা পুস্তকালয়, কাকদ্বীপ M. 9609373449 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও, M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বাদকুল্লা বিজ্ঞান পরিষদ M. 8617484259/9933895255 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • নারায়ণচন্দ্র রানা সায়েন্স ক্লাব, বালিঘাই M. 9800436364 • ষড়ানন পন্ডা M. 6294168840

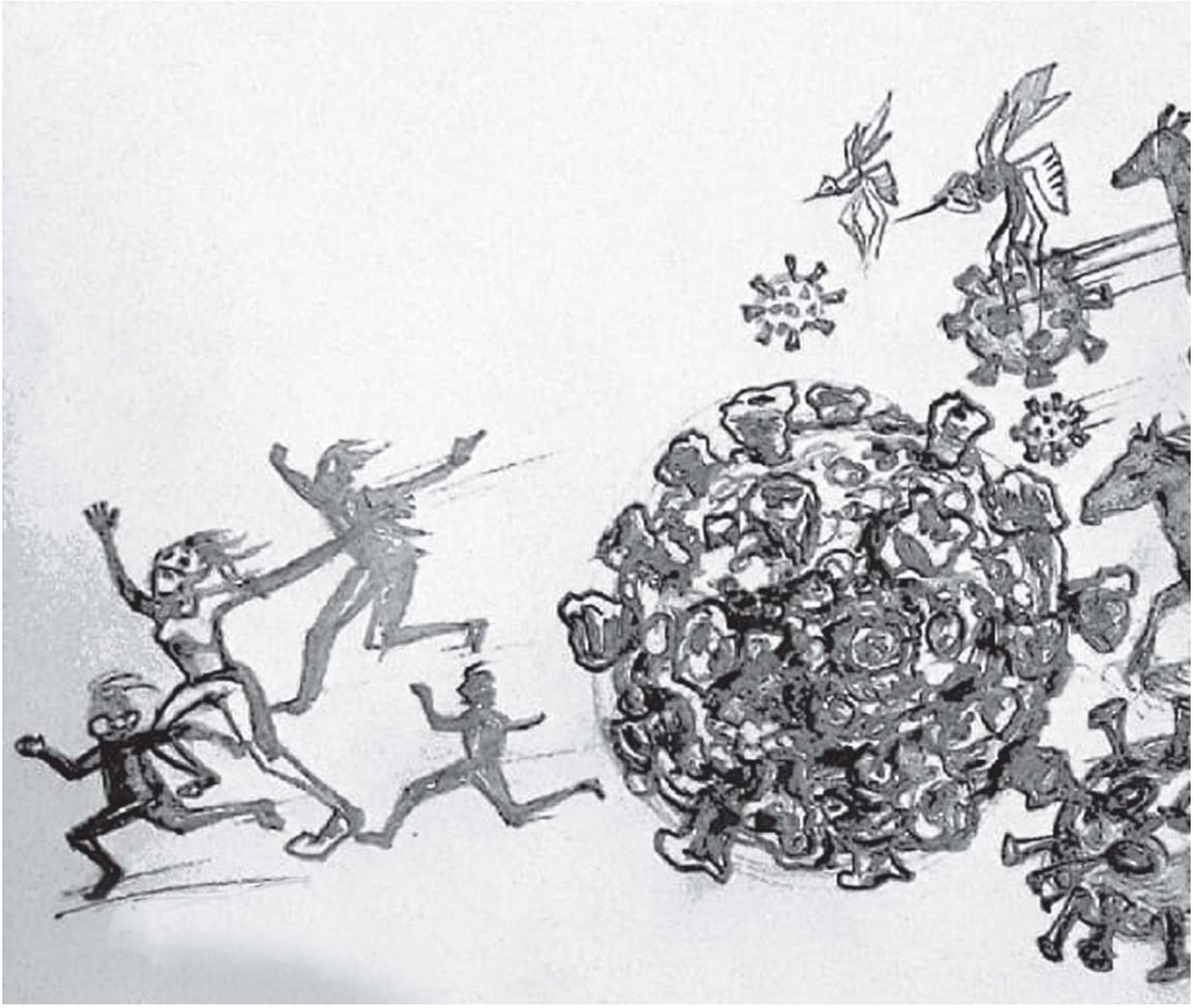

নন্দগোপাল পাত্র

পরিবেশ শিক্ষক : কোভিড ২০১৯

পুরনোকে নিশ্চিহ্ন করে, পাতা ঝরিয়ে গাছে যেমন নতুন কুঁড়ি ফোটে তেমনই প্রকৃতি সব সময় নতুনকে আহ্বান করে। সেই প্রকৃতি আজ আত্মরক্ষার কবচ হিসেবে বেছে নিয়েছে এক নতুন অস্ত্র, ভাইরাস। সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃতি ও জীবনের ধ্বংসের মূলে মানুষ, তাই মানুষের বিলুপ্তি পৃথিবীর স্বাস্থ্যের জন্য আশু প্রয়োজনীয়। করোনা ভাইরাসের জন্য এই গ্রহের জীবকুল স্বস্তি পেয়েছে। সেই সঙ্গে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিশ্বে মানব অস্তিত্বের স্তম্ভ নড়বড়ে করে দিয়ে মানুষকে যেন এনে দাঁড় করিয়েছে সংকটময় ভবিতব্যের সামনে!

ওকে বাঁধবি কে রে

গত জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে ভারতে প্রথম মিলল নভেল করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি। জানুয়ারির ৩১ তারিখে সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় ছোট্ট করে খবর, ভারতে করোনা। পরেরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হল চিনের গণ্ডি পেরিয়ে আরও ১৮টি দেশে করোনা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ২২ মার্চ, ২০২০। এই দিনটার কথা বোধহয় অনেকেই জীবনে ভুলতে পারবে না। ওই দিন চলছিল একদিনের জন্য জনতা কারফিউ। তার মধ্যেই জানা গেল, রাত ১২টা থেকে এক সপ্তাহের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই দেশজুড়ে ট্রেন বন্ধের মত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি তার আগের প্রজন্মও। তারপর দিনই আবার ঘোষণা হল, ২১ দিন ধরে চলবে লকডাউন। শুরুতে লকডাউন ব্যাপারটার গুরুত্ব মানুষ অতটা বুঝতে পারেনি। শুধু আমি নই, বড়রাও অনেকে বুঝতে পারেননি। মনে হয়েছিল নিছক কাজকর্ম বন্ধ থাকবে।

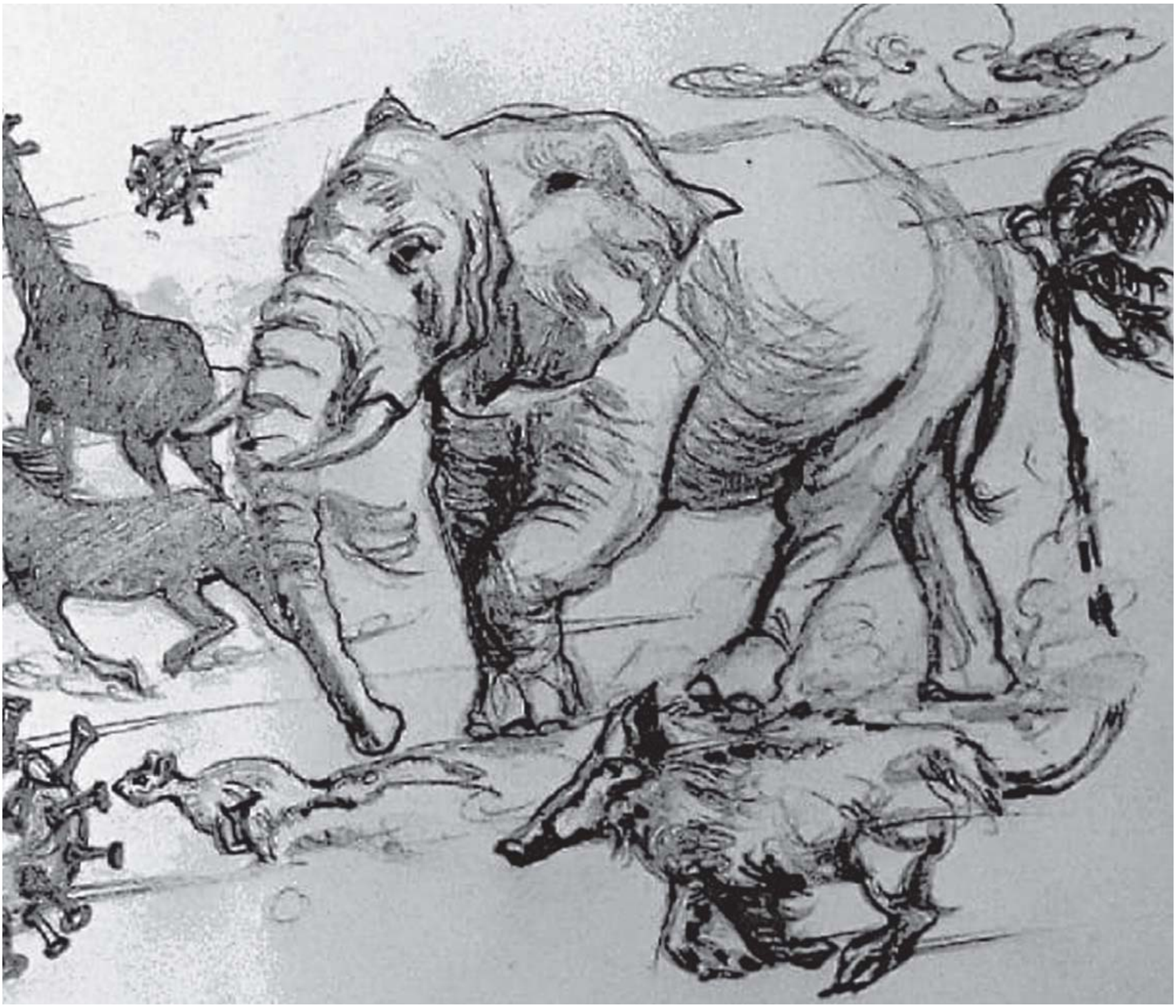

ঘোরা, বেড়ানো, আমোদ আহ্লাদ সবই চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে সেরকম নয়, সেটা মানুষ টের পেল যখন টিভিতে খবর দেখতে দেখতে বুঝতে পারল করোনা ভাইরাস যেরকম তাণ্ডব চালাচ্ছে বিশ্বজুড়ে, তাতে লকডাউন ছাড়া উপায় নেই। ধীরে ধীরে মুখে মাস্ক পরা, বারে বারে হাত ধোয়া এইসব ব্যাপারে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেল। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির কেউই বাইরে বেরচ্ছে না। একটানা সবাই ঘরবন্দি।

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে

সড়ক ও আকাশ পরিবহণ দুইই বন্ধ দেশে। আকাশ এবং বাতাসে জমা ধোঁয়া পরিষ্কার হতে সময় লাগল না। আকাশ অনেক বেশি নীল দেখাল, শুধু তাই নয়, শহরের বাতাসে দূষিত গ্যাস, ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণার পরিমাণ যে কমছে তা কোনও বিশেষ ধরনের যন্ত্র ছাড়াই বোঝা যাচ্ছিল। আকাশ জুড়ে পরিষ্কার ঝকঝকে রামধনু দেখা গেল। সব সময় দেখা যে যায় না, তা নয়। তবে এমন পরিষ্কার ভাবে সাম্প্রতিক অতীত তো ছাড়, সুদূর অতীতেও সাতটি রং শেষ কবে দেখা গিয়েছিল, তা বেশির ভাগ মানুষেরই স্মৃতির আকাশে অস্পষ্ট।

পৃথিবীতে মোট কার্বন নিঃসরণের এক চতুর্থাংশ ঘটে থাকে যে পরিবহণের কারণে, তা ব্যাপক হ্রাস পেতে শুরু করল। পৃথিবীর অন্য দেশ—আমেরিকা, ইতালি, স্পেন এবং ব্রিটেনে দূষণ নিঃসরণের পরিমাণ ব্যাপক কমেছে, বাতাসের শুদ্ধতার মানেও বৃদ্ধি ঘটেছে। ভারতের শহর এবং শহরতলিতে দূষণের মাত্রা কমেছে। নয়াদিল্লি ও মুম্বই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। চিনে উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখা গেল, দূষণের মাত্রা সেখানে ব্যাপক কমেছে। বিবিসির এক রিপোর্ট অনুসারে লকডাউনের ফলে গত বছরের তুলনায় সেখানে নিঃসরণের পরিমাণ কমেছে ২৫ শতাংশ এবং ৩৩৭টি শহরে ভাল মানের বাতাসের অনুপাত বেড়েছে ১১.৪ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় নিউইয়র্কে কার্বন মনোক্সাইডের

আকাশজুড়ে ঝকঝকে রামধনু

পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। লকডাউনের দূষণহীন পরিষ্কার আকাশে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন ১৬০০ আলোকবর্ষ দূরের তারা। যাদের অনেকগুলির কথাই আগে জানা ছিল না। করোনা ভাইরাসের এক ধাক্কায় দূষণ নিম্নগামী, নদী হ্রদ সমুদ্র পরিষ্কার এবং গাছ নিশ্চিন্ত, প্রকৃতি মুক্ত।

করোনা ভাইরাসের কারণে যখন জীবনহানির শঙ্কায় মানুষ, তখন যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে পৃথিবী। দেশজুড়ে লকডাউনের জেরে প্রকৃতি একেবারে শান্ত-নিঝুম, তা মুম্বই হোক কিংবা কলকাতার মত দেশের বিভিন্ন ব্যস্ততম শহরগুলো। রোজ সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙছে শহরবাসীদের। শুধু শহর নয়, গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া হরেক রকমের পাখি যাদের এক সময় অবাধ বিচরণক্ষেত্র ছিল বাংলার মাঠঘাট, নদী, খাল বিল-এ। এই প্রজন্মের অনেক শিশু কিশোর কখনও দেখেনি মুক্ত আকাশে উড়ত এ সব পাখি, শোনেনি এদের ডাকও। এই করোনার সৌজন্যে তারাও ফিরে এসেছে। করোনা ভাইরাস কি প্রকৃতির কাছে কিছুক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে এল? এর উত্তর হ্যাঁ। আর লকডাউনের সুবাদে বেশকিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের দেখা মিলছে রাস্তায়। কোথাও জেব্রা ক্রসিংয়ের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বনবিড়াল, তো কোথাও রাতের রাজপথে নেমে ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিণরা। কিংবা কোনও সমুদ্র সৈকতের কাছে ডলফিনের ঝাঁক খেলছে তো আবার প্রকাশ্য দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইসন, নীলগাই, আবার জনশূন্য সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছে কচ্ছপরা। পরিবেশপ্রেমীদের কথায়, এসব অকল্পনীয় দৃশ্য! প্রকৃতি যেন শ্বাস নিচ্ছে। অকল্পনীয় দৃশ্যই বটে! চন্ডীগড়ে স্ট্রিটলাইটের আলোয় রাতের রাস্তা পেরচ্ছে এক হরিণ। নয়ডার রাস্তায় নীলগাইকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। অনেকটা চিতা বাঘের মত দেখতে বিরাটাকার বিলুপ্তপ্রায় এক বনবিড়ালকে দেখা গেল কেরালার কালিকটের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে। পশুপ্রেমীদের দাবি, শেষবার এই প্রাণীটিকে ১৯৯০ সালে দেখা গিয়েছিল। মুম্বইয়ের সমুদ্রতটের কাছে নীল জলরাশির মাঝে ডলফিনদের অবলীলায় খেলা করতে দেখা গিয়েছে। সব অসম্ভবকেই যেন সম্ভব করে তুলছে করোনা ভাইরাস। হ্যাঁ, লকডাউনের মধ্যে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নানা প্রান্ত থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন চূড়া দেখা গেছে। প্রতিবেশী নেপালের কাঠমান্ডু থেকে ২০০ কিমি দূরে এভারেস্টকেও দেখেছেন সাধারণ মানুষ।

নির্জন শহরে হরিণের পাল

বহে নিরন্তর আনন্দ ধারা

করোনা ভাইরাসের সৌজন্যে যেমন নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে প্রকৃতি, তেমনই বদলে যাচ্ছে অনেক নদীর চেহারাও। গঙ্গা, যমুনার দূষণমুক্ত চেহারা দেখে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত পরিবেশকর্মী থেকে সাধারণ মানুষ। নিছক সংস্কারের বশে এখনও বহু মানুষ গঙ্গায় স্নান করেন। এমনকি গঙ্গার জল পান করেন তাঁরা। এতে পুণ্য অর্জন হোক বা না

হোক, শরীরে প্রবেশ করে নানা ক্ষতিকর পদার্থ। নদী তীরবর্তী কলকারখানা এবং হোটেল ও ধর্মশালার বর্জ্যপদার্থ এসে মিশত গঙ্গার জলে। আর তার ফলেই মারাত্মক দূষণের শিকার হত ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের ধাত্রী গঙ্গা নদী। লকডাউনের ফলেই নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে গঙ্গা নদী। চুরাশি দিনের লকডাউন যেন পুরো ছবিটাই বদলে দিল। গঙ্গার জল এখন স্নান করার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করছেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিশেষজ্ঞরা। আইআইটি বেনারসের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ জলের নমুনা পরীক্ষা করে জানিয়েছে, অনেকটাই 'শুদ্ধকরণ' হয়েছে গঙ্গার। অন্তত ৪০-৫০%। লকডাউনের আগের চেয়ে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বেড়েছে। কমেছে ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা তিন বছর ধরে মনিটরিং করছি। এতদিন হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে, নানা উপায় ব্যবহার করেও যে সাফল্য আমরা পাইনি, তা লকডাউনের এই ১০ দিন দেখিয়ে দিয়েছে। বারানসীর গঙ্গায় পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ৮-৯ মিলিগ্রাম/লিটার রয়েছে। সাধারণত ৫-৬ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি থাকে না। জৈব-রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা প্রতি লিটারে ৬-৭ মিলিগ্রামের আশপাশে থাকে, সেটা কমে ২-২.৫ মিলিগ্রাম/লিটারে দাঁড়িয়েছে। ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া প্রতি ১০০ মিলিমিটারে হামেশাই ২০ হাজারের উপরে থাকে, সেটাও কমে দুহাজারে নেমে এসেছে।' এরপর আরও দুমাসে গঙ্গার দূষণমুক্তি ঘটেছে। করোনা উত্তর সময়ে গঙ্গা নদীর এই দূষণমুক্ত চেহারা কীভাবে ভবিষ্যতেও ধরে রাখা যায়, সেই বিষয়েই চিন্তিত সংশ্লিষ্ট সকলেই।

উত্তরের সঙ্কোশ থেকে দক্ষিণের বুড়িগঙ্গাকে নিয়ে আমাদের রাজ্যে বড় নদীর সংখ্যা ১১০টি। কয়েক বছর আগেই পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্যের কিছু নদীকে দূষিত নদী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। লকডাউনের মধ্যে ওই নদীগুলোর জলের গুণমান পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রায় সব নদীতে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে গেছে। আত্রেয়ী নদীতে একটা বিশেষ মাছ পাওয়া যেত। যার নাম রাইখর। দূষণের জন্য মাছটা প্রায় নদী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু লকডাউনের মাঝামাঝি সময় থেকে আত্রেয়ীতে রায়খর মাছের আনাগোনা বেড়েছে। তিস্তা ও তোর্সা নদীতেও বোরলি মাছ ফিরে এসেছে। তাদের ফেরার সংখ্যাটা আগের থেকে অনেক বেশি। লকডাউন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের আরও পরিবেশবান্ধব হতে হবে। শিক্ষা না নিলে 'জিরো সাম গেম'-এর মত আবার আগের জায়গাতেই ফিরে যাবে নদী।

লকডাউন যখন একমাসের মাথায়, ওড়িশায় ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় মৎস্য শিক্ষণ সংস্থার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট কালীকৃষ্ণ মহাপাত্র জানিয়েছিলেন, 'লকডাউনের ফলে জলজ পরিবেশের প্রভূত উন্নতি ঘটবে তার ইঙ্গিত আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর বৃহত্তম খাঁড়িমুখের প্রায় সাড়ে ১৯ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পরিবর্তন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের হিসেব মত সাগরদ্বীপ থেকে দিঘার মুখ (বঙ্গোপসাগর) পর্যন্ত এই খাঁড়ি মুখ জলজ প্রাণীর যাতায়াতের পথ। এই পথে সাড়ে চোদ্দ হাজার মাছ ধরার জাল বিছানো থাকে। একেকটি জালের দৈর্ঘ্য প্রায় চার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ ছাড়াও অসংখ্য ছোট নৌকো মাছ ধরে। বিপুল পরিমাণ কর্মকাণ্ড চলে এই জলপথে। এখন এসব বন্ধ। কালীকৃষ্ণের মতে, এর ফলে বিভিন্ন জলজ প্রাণী, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ, ইলিশ, ডলফিন, নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে পাবে।

আজি হে ভারত লজ্জিত হে

লকডাউনের সরকারি ঘোষণায় অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ জরুরি পরিষেবাভুক্ত ছিল। ভারতে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের অধীনে প্রাণীকুল গুরুত্ব ও বিপন্নতার নিরিখে কয়েকটি শিডিউল বা তফশিলভুক্ত। প্রথম তফশিলে আছে কৃষ্ণসার, চিতা, বাঘ, গন্ডার, হাতির ন্যায় 'সর্বাধিক সংরক্ষণযোগ্য' প্রাণী। লকডাউনে এই প্রাণীরাই লক্ষ হয়েছে বেশি। কিন্তু শজারু, লাঙ্গুর, চিতল, হরিণ, সম্বর, বন্য শূকরের ন্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফশিলভুক্ত প্রাণীর চোরাশিকারের ঘটনা খুব বেশি বাড়েনি।

আসামের বাঘজানের তৈলখনিতে আগুন লাগল ৯ জুন। বাঘজানের কাছেই ডিব্রু সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান বেশ কিছু বিরল প্রজাতির প্রাণীর বাসভূমি। একটি বৃহৎ জলাশয়ও জীববৈচিত্রের কারণে সংরক্ষিত। সম্পূর্ণ এলাকাটি বিশ্বের ৩৫টি সর্বাধিক সংবেদনশীল প্রাণীবৈচিত্রময় অরণ্যের একটি। তৈলখনি থেকে চৌদ্দ দিন ধরে নির্গত গ্যাস এবং আগুন লাগার পর উৎপন্ন ধোঁয়া ও তাপ এই অঞ্চলটির যে ক্ষতি করল, তাহার পরিমাপ অসম্ভব। 'জাতীয় বন্যপ্রাণী পরিষদ' দূষণকারী শিল্প থেকে বন্যপ্রাণের সুরক্ষার প্রধান দায়িত্ব পালন করে। অথচ পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষার বিধিগুলি উপেক্ষিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কেউ কান দেয়নি। বিরল প্রজাতির বিলুপ্তির অপূরণীয় ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করা হয়নি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, লকডাউন চালকালীনই বেশ কিছু অভয়ারণ্যের কাছে উন্নয়ন প্রকল্প শুরুর অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাব উদ্বেগজনক। শিল্পস্থাপন, খনিজ উত্তোলন, উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ সরকারের দায়িত্ব। প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু অভয়ারণ্য ধ্বংস হবার মূল্যে, মানুষের প্রাণের মূল্যে তা করতে হবে কেন? নিরাপত্তা ও প্রকৃতি সংরক্ষণের বিধি মেনে শিল্পায়নের দৃষ্টান্ত তো বিশ্বে কম নেই।

আরেকটি আশঙ্কার কথা জানিয়েছে 'বায়োলজিক্যাল কনজারভেশন'। অর্থনীতির উপরে লকডাউনের নিশ্চিত প্রভাব পড়েছে। লকডাউন উঠলে বিপাকে পড়তে পারে জঙ্গল নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো। অর্থের জোগান কমবে। জীববৈচিত্র রক্ষায় তার পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে।

ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে

বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে আছে ওজোন স্তর, যা সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর রশ্মিকে আমাদের এই পৃথিবীতে আসতে দেয় না। অর্থাৎ ওজোন স্তর যদি না থাকে তাহলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে যা মানুষ, প্রাণী এবং উদ্ভিদের জন্যে ক্ষতিকর। নানা ধরনের কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই ওজোন স্তর, সেখানে বড় বড় গর্ত তৈরি হচ্ছে যার ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে ক্ষতিকর রশ্মি। লকডাউনের মধ্যে একদল বিজ্ঞানী জানিয়েছিলেন লকডাউনের সঙ্গে ওজোন স্তরের ক্ষত সরানোর কোনও সম্পর্ক নেই। ওই বিজ্ঞানীদের

মতে এক শক্তিশালী এবং দীর্ঘকালীন মেরু ঘূর্ণির জন্য এটি ঘটেছে। কাকতালীয়ভাবে তা লকডাউনের সময়ে ঘটেছে।

তুমি নব নব রূপে এস

করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় হঠাৎ করেই বেশ কয়েক গুণ কদর বেড়ে গিয়েছে প্লাস্টিকজাত পণ্যের—ভেন্টিলেটর, টেস্টিং কিট, গ্লাভস, ডিজপোজেবল সিরিঞ্জ, পার্সোনাল প্রোটেকশন ইক্যুইপমেন্ট, ওষুধ-স্যালাইন ও স্যানিটাইজারের বোতল এমনই আরও কত কী। সেই

করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার বেড়েছে

কারণেই প্লাস্টিকের চিকিৎসার সরঞ্জাম বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী তৈরি করে এমন প্রতিটি সংস্থার প্রয়োজনীয় কাঁচামালকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। চিকিৎসা ও স্বাস্থসুরক্ষা উপকরণের পাশাপাশি খাদ্যপণ্যে ও বন্টনেও প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়েছে। লকডাউনে দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলিকে প্লাস্টিকের প্যাকেটে খাবার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া চাল, ডাল দেওয়ার জন্যও ক্যারিব্যাগের ব্যবহার হয়েছে। পরিবেশ বাঁচাতে প্লাস্টিক বর্জনের স্লোগান করোনার সময় মানা হল কই!

অন্তর মম বিকশিত কর

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'ন্যাচারাল ল অব রিভেঞ্জ বা প্রকৃতির প্রতিশোধ'। এটা প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে মেনে চলে। করোনা ভাইরাসের দাপটে এই গ্রহের অধিকাংশ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লেও সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে তার সজীবতা। যার জন্য আমরা দেখতে পেয়েছি প্রকৃতির অভূতপূর্ব পরিবর্তন। বিগত কয়েক দশক ধরে নগরায়ন ও শিল্পায়নের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিবেশের যে সামগ্রিক দূষণ চিত্র দেখা যাচ্ছিল, লকডাউনের ফলে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। মনে পড়ছে গ্রেটা থুনবার্গ নামে সুইডিশ কিশোরীর কথা। সারা বিশ্বের কাছে হাতজোড় করে দূষণ রোধ করার জন্য আন্দোলন করেছিল। আমরা বড়রা শুনিনি তার কথা। কিন্তু এই বসুন্ধরা বোধহয় শুনেছিল থুনবার্গের আর্তি। তাই করোনা ভাইরাসের মারণ ছায়ায় আমাদের দেশে হয়ে গেল ৬৮ দিনের লকডাউন, আর আনলক ৪.০ পর্ব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীবকুল আতঙ্কে কাঁপছে। সেইসঙ্গে ধীরে ধীরে আকাশ থেকে সরে যাচ্ছে দূষিত গ্যাসগুলোর বিষবাষ্প। আকাশ এখন গাঢ় নীল। ভোর হলেই কিচমিচ করতে করতে উড়ে যাচ্ছে পাখির দল। কাঠবিড়ালিটা এসে বসছে জানলার কার্নিশে। এই পৃথিবীটা যে তাদেরও এতদিনে বুঝছি আমরা।

বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ও নিচ্ছে এই মারণ ভাইরাস। পৃথিবীর অনেক শিশুর, পরিজনদের অনাথ করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। পরিবেশ ও প্রকৃতির বিপন্নতা মানে মানুষেরও বিপন্নতা। সেই সরল সত্যটুকু বুঝিয়ে দিল করোনা ভাইরাস। যা বোঝানোর জন্য আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক স্তরে কত আলোচনা, কর্মশালা, চুক্তি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বলে রাখি আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনায় সময় কেটে যায় মূলত কূটনৈতিক চাপানউতোরে। যেন পৃথিবীকে বাঁচানোর তুলনায় দেশের ক্ষুদ্রস্বার্থ রক্ষা করা বেশ জরুরি। আইপিসিসি-র চতুর্থ রিপোর্ট প্রকাশের পর প্রায় দেড় দশক কেটে গেল। পরিবেশ রক্ষার্থে কোনও দেশই এখনও নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করে উঠতে পারল না। ইকোলজির থেকে ইকনমিক্সকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়েই বেঁধেছে যত গণ্ডগোল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আর্থিক কর্মকাণ্ডের পরিসর তৈরির জন্য বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম মাটি-জল-বায়ু-অরণ্য এসবই মানুষের আসল সম্পদ। সব

অন্ধকারের উল্টোপিঠেই থাকে আলো। সব রাত্রি শেষ হয়, ওঠে ভোরের সূর্য। আমরাও দেখতে পাব রোগমুক্ত নতুন পৃথিবী। তখন যেন ভুলে না যাই পরিবেশের যত্ন নিতে হবে।

email:ngpatra@gmail.com • M. 9434341156

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ প্রকাশিত
সারস্বত গ্রন্থরাজি

ক) বিজ্ঞান পরিবেশ বিষয়ক :

১। মৌমাছি পালনের কথা—সম্পাদনা : দীপককুমার দাঁ। ২০১২, ১০০ টাকা, ১৭৬ পৃষ্ঠা।
[হাতে-কলমে এপিস মেলাফেরা প্রজাতির মৌমাছি পালন বিষয়ে রয়েছে বহু খোঁজখবর।]

২। রাধানাথ শিকদার (গণিতবিজ্ঞানী)—সংকলন-সম্পাদনা : দীপককুমার দাঁ। ২০১২, ৪০ টাকা, ৬৪ পৃষ্ঠা।
[ভারতের প্রথম গণিতরত্নের জীবনকথা। নিঃশেষিত।]

৩। সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রজননবিজ্ঞানী ড. অরুণকুমার রায়চৌধুরী (নির্বাচিত বাংলা বিজ্ঞান রচনার সংকলন)—সম্পাদনা : দীপককুমার দাঁ। ২০১৩, ১৫০ টাকা, ২৪০ পৃষ্ঠা।
[বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ।]

৪। বাংলা ভাষায় পাখিচর্চা (নিঃশেষিত)—সংকলন : দীপককুমার দাঁ।
[পাখি নিয়ে লেখালেখির একটি পঞ্জিকরণ প্রয়াস।]

৫। Reminiscences and Reflections of a Septuageneration—P.N. Bose. Ed. Prof. Subir K. Sen (Chief Editor), 2013, Rs. 140, 240 Pages.
[ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসুর আত্মকথা, যা অমৃতবাজার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৩২-৩৪ সময়কালে।]

৬। গোবরডাঙা পৌরসভা জনজীব প্রজাতি বৈচিত্র্য তালিকা—দীপককুমার দাঁ। ২০১৪, ৪০০ টাকা, ১৬৭ পৃষ্ঠা।
[আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য চর্চায় বইটি অপরিহার্য। নিঃশেষিত।]

৭। বাঙালি মননে বিজ্ঞান চেতনা—বিজ্ঞান সাধনা (১ম ভাগ)—শতাব্দী দাশ। ২০১৫, ১৫০ টাকা, ১৬০ পৃষ্ঠা।
[৩০ জন অগ্রজ বাঙালি বিজ্ঞানীর জীবনালোচনা।]

৮। নদীকথা—হুগলি-ইছামতী অববাহিকায় (বিলুপ্ত ইতিহাসের প্রান্তসীমায়)—সুকুমার মিত্র (২য় সংস্করণ)। ২০১৮, ১২০ টাকা, ১২৮ পৃষ্ঠা।
[এলাকার নদনদী নিয়ে এমন প্রামাণ্য নথি এই প্রথম।]

৯। মাছ, জল, মৎস্যজীবী ৯১ম)—ড. সূর্যেন্দু দে। ২০১৭, ২৫০ টাকা, ১৬০ পৃষ্ঠা।
[গ্রামবাংলার মৎস্য সম্প্রদায়ের উপর একটি নির্দিষ্ট গবেষণা প্রয়াস]

১০। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী নারায়ণচন্দ্র রানা—সংকলন-সম্পাদনা : দীপককুমার দাঁ। ২০১৭, ৩০০ টাকা, ২৫৬ পৃষ্ঠা।
[অল্পবয়সে প্রয়াচ বিজ্ঞানী নারায়ণচন্দ্রের বাংলায় বিজ্ঞান নিবন্ধ রচনা; সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনকথা।]

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ

অবাধ-সারস্বত জ্ঞান চর্চায় নিবেদিত

গ্রাম ও পো: - খাঁটুয়া, থানা - গোবরডাঙা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা
যোগাযোগ : দীপককুমার দাঁ, ৯০৬৪৭৫৭০৮৪

১১। আধুনিক জীববিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যের সহজ পাঠ—সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, অনিন্দিতা জোয়ারদার। ২০১৭, ১৫০ টাকা, ১৬০ পৃষ্ঠা।
[রোগবালাই প্রতিরোধে জীবাণু-ভাইরাসের বিষয়ে সরস-সহজ আলোচনা। প্রধানত ছাত্রছাত্রীদের জন্য।]

১২। হারিয়ে যাওয়া আমের খোঁজে—সংকলন : দীপককুমার দাঁ। ২০১৯, ১৬০ টাকা, ১২৮ পৃষ্ঠা।
[পশ্চিমবাংলার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফসল আম বিষয়ে এমন মূল্যবান আলোচনা এই প্রথম।]

খ) মনস্বী বিজ্ঞানলেখক গণিথ ইতিহাসকার নন্দলাল মাইতির গ্রন্থাদি :

১। গণিত ভুবনের স্রষ্টা ও সৃষ্টি। ২০১৬, ১৫০ টাকা, ১৬০ পৃষ্ঠা। (নিঃশেষিত)
২। রাধানগরের সর্বাধিকারী ও প্রসন্নকুমার। ২০১৭, ২০০ টাকা, ১৯২ পৃষ্ঠা।
৩। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যের যাঁরা স্থপতি। ২০১৮, ২০০ টাকা, ১৭৬ পৃষ্ঠা।
৪। গণিতের রত্নভাণ্ডার। ২০১৯, ৩০০ টাকা।
৫। গণিতসাধনার ধারায় ও অন্যান্য। ২০১৯, ২০০ টাকা, ১১২ পৃষ্ঠা।

গ) পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাদি :

১। মাথা ভরা ম্যাথ—বিশ্বনাথ বসু। ২০১৮, ৭০ টাকা, ৬০ পৃষ্ঠা।
২। সোনলি অনুপাতের রহস্য—ড. বরুণকুমার দত্ত। ২০১৯, ৭০ টাকা, ৪০ পৃষ্ঠা।
৩। গণিতের ব্যাকরণ ও ভাষাগত সাদৃশ্য—মনোতোষ কুমার মিত্র। ২০১৯, ৭০ টাকা, ৪৮ পৃষ্ঠা।
৪। গণিতের অন্দরমহল—মনোতোষ কুমার মিত্র। ২০১৯, ১৩০ টাকা, ১০৪ পৃষ্ঠা।
৫। প্রসঙ্গ : মৌলিক সংখ্যা—ড. বরুণকুমার দত্ত। ২০২০, ১২০ টাকা, ৮০ পৃষ্ঠা।

ত্রৈমাসিক গণিতভাবনা

ছাত্রছাত্রী ও সর্বসাধারণের জন্য।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বনাথ বসু। প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা। গ্রাহক চাঁদা : এক বছর ২০০ টাকা। তিন বছর : ৫০০ টাকা। (স্পিড পোস্টে পাঠানো হয়।)
যোগাযোগ : দীপককুমার দাঁ। ৯০৬৪৭৫৭৬৮৪

স ব্য সা চী চ ট্টো পা ধ্যা য়

কিছুই আর আগের মত রইল না : কোভিদ-উত্তর জমানার খণ্ডচিত্র

ইতিহাসসন্ধানীর কাছে নিশ্চয়ই অতিমারীর ইতিহাস আশা করছেন। বিশেষ করে যে ব্যক্তি পরিবেশ আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চা করেন তার কাছে তো সেই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বলি, ইতিহাস নয়, আজ বরং বলি ভবিষ্যতের কথা তাহলে কি অবাক হবেন? কেমন হতে চলেছে কোভিদ-উত্তর জমানা? সে ছবিই বরং তুলে ধরি আজ। হতে চলেছে লিখেই মনে হল, হতে চলেছে কি বলা যায়? নাকি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরুই হয়ে গেছে?

প্রথমে খাওয়ার কথা বলি। কেউ কখনও ভেবেছিল যে বাজার থেকে এসে আগে সব কিছু ধুয়ে নিতে হবে? তা শুধু জল দিয়ে নয়; দস্তুরমত সাবান জল আর জীবাণুনাশক দিয়ে। আবার সবজি আর ফল ডুবিয়ে রাখতে হবে ভিনিগারে? খাবার তো রান্নাঘরে ঢুকল। এবার রান্নার পালা। এক্ষেত্রেও বারবার হাত ধোয়া। কী বললেন, কড়াতে তেল ঢালতে গিয়ে ভুল করে স্যানিটাইজার উপুড় করে দিয়েছেন?

পোশাকের কাজ যে মূলত শরীর ঢেকে রাখা তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল কোভিদের দিনগুলো। পিপিই হয়ত চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন পরছেন কিন্তু আমাদের আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করে দেওয়া পোশাকও কি 'পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুয়েপমেন্ট' নয়? সদাই ভয়, দেহে ড্রপলেট যেন না ঢুকে পড়ে। আর যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরের আশঙ্কা সত্যি হয়, যদি কোভিদ ১৯ বায়ুবাহিত হয় তবে কি আমাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা মোড়ক আমাদের বাঁচাতে পারবে? তাও সাবধানের মার নেই। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখা যদি মনে হয় সর্বত্রগামী হয়নি তবে এটুকু তো মানবেন যে মুখ ঢেকেছে মাস্ক বা মুখোশে। আর এটা একেবারে বাধ্যতামূলক। মুখোশ পরে বাড়ি থেকে বাইরে না বেরোলে আপনি গ্রেফতার হতে পারেন। আর যদি গ্রেফতার নাও হন পুলিশ আপনাকে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে। একেবারে আইনমাফিক। যেহেতু মাস্কই এখন আবরণের মধ্যমণি তাই নজর করছেন কি কত বাহার মাস্কে। নানান রং আর নক্সার পাশাপাশি এসে গেছে নানান প্রতীক। পতাকা আর মানচিত্র যেমন তার মধ্যে আছে তেমনই আছে ক্লাবের লোগো। কলকাতা ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের জার্সিং রং সবুজ-মেরুন আর লাল-হলুদ আর তার সঙ্গে তাদের প্রতীক পালতোলা নৌকো আর মশালের ছবি দেওয়া মাস্ক নিশ্চয়ই দেখা হয়ে গেছে আপনার। দেখে ফেলেছেন মুখে আঁটা পদ্ম বা জোড়া ফুল। কলকাতা পুলিশের লোগো লাগানো মাস্কও নিশ্চয়ই দেখে

ফেলেছেন। আমি এক বিজ্ঞান সংগঠনের লোগো লাগানো মাস্কও দেখেছি এক বিজ্ঞানকর্মীর মুখে। তবে মজা হল মুখ জুড়ে আছে যে মাস্ক তা আসলে মুখ ঢেকে দিয়েছে আমাদের। আর তার ফলে মুখের প্রসাধন ব্যবস্থা মাটি হতে বসেছে। ওষ্ঠকাঠি বিক্রেতার ক্যাটালগের পাতা উল্টে রং আর তার শেড দেখে দেখে নম্বর নির্দিষ্ট করে দোকানে ভিড় জমানোর দিন শেষ। অনলাইনেও এই জিনিসটির বিক্রি যে কমবেই, তা বলাবাহুল্য। ফেয়ারনেস ক্রিম-এর নাম পাল্টেছে আমেরিকায় 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনের ফলে, আর এই 'রাজনৈতিক' সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করে ফেয়ারনেস ক্রিমকেই বোধহয় বাতিল করে ছাড়ল কোভিদ কাণ্ড।

নব্য স্বাভাবিকতার যে যুগের কথা আমরা শুনেছি সেই যুগে হাত ধরে হাঁটার গল্প নেই। নেই আক্ষরিক অর্থে বেঁধে থাকার গল্প। বরং এখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথাই বলা হচ্ছে। পথেঘাটে হাত ধরা আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা যাবে না ঠিকই। কিন্তু তার বদলে সেই কাজটাই হবে বা হয়ে চলেছে সামাজিক মাধ্যমে। শুধু টুকটাক মন্তব্য বা মত প্রকাশ নয়, নিয়ম করে বিভিন্ন পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ বেরিয়ে চলেছে, হোয়াটস অ্যাপে একের সঙ্গে একের যোগাযোগে বা গ্রুপে ঘুরে চলেছে নানান পত্রিকার পিডিএফ। কাজেই এক অন্যরকম বেঁধে বেঁধে থাকার পর জগৎ জুড়ে, বিশ্বজোড়া জালের এই নব্য স্বাভাবিকতাকেই কি ইংরেজিতে নিউ নেটওয়ার্ক বলা যায়?

এর ওর বাড়ি যাওয়া বন্ধ। নিজের বাড়িই নিশ্ছিদ্র করার আয়োজন। বলছি বটে বাড়ি ঢুকে পড়তে কিন্তু এই খবর কি নিচ্ছি যে প্রত্যেকের বাড়িতে সবার থাকার মত ঘর আছে কিনা? তা না হলে ঘেঁষাঘেষি আর ঠাসাঠাসি করা ঘরে আর সামাজিক দূরত্ববিধি মানা হবে কি করে।

কোভিদ যে কত শিক্ষা দিয়ে গেল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ফাঁকগুলো। লকডাউন করা হয়েছিল আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সময় দিতে কিন্তু তা যে বাস্তবে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি তা তো চারদিকে তাকালে বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে এটুকু শিক্ষা বোধহয় অর্জিত হল যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মোদ্দা বিষয় শুধু রোগ নিরাময় নয়, রোগ প্রতিরোধ বেশি জরুরি। আর তার জন্য জোর দিতে হবে জনস্বাস্থ্যে।

কোভিদের শিক্ষার কথা বলছি আর শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলব না তা কি হতে পারে? সত্যি কথা বলতে কি শিক্ষার ধরনটাই পুরো বদলে গেল এই ক'মাসে। ১৬ মার্চ থেকে এ-রাজ্যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে সংক্রমণের আশঙ্কায়। আর তার পরিবর্তে তার দিন সাতেকের মধ্যেই চালু হয়ে গেছে অনলাইন শিক্ষার আয়োজন। কেউ কেউ হয়ত একটু পরে শুরু করেছেন কিন্তু এই উদ্যোগে একেবার সামিল হননি এমন শিক্ষকের সংখ্যা হাতে গোনা। তাহলে কি শিক্ষার ধরনটাই গেল পাল্টে? অনলাইন শিক্ষাই এখন নব্য স্বাভাবিক? সমস্যা নেহাত কম নয়। ভাল মানের প্রযুক্তির বন্দোবস্ত আর তা ব্যবহার করার আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে এক বড় অংশের শিক্ষার্থীই এই প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ে যাবে। ব্যবধান আর বিভাজন বেড়েই চলবে শিক্ষাজগতে; একেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'ডিজিটাল ডিভাইড'। কিন্তু প্রশ্নটা কি শুধু আর্থিক সামর্থ্যের? শিক্ষক যে শিক্ষার্থীর চোখ দেখে বুঝতে পারেন তাঁর শিক্ষা কতটা পৌঁছচ্ছে ছাত্রের কাছে, কোনও বিষয় ফের বোঝানো দরকার কিনা, তার কী হবে! আর কোনও বিষয় পড়ানোর পরে কোন শিক্ষার্থীর চোখগুলো জ্বলজ্বল করে ওঠার যে অভিজ্ঞতা শিক্ষককে তৃপ্তি দেয় তা কি পুরোপুরি অতীত হয়ে গেল?

আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে বোধহয় কচিকাঁচার দল। এতদিন তারা মোবাইল হাতে নিলেই বড়র দল আপত্তি করেছে; বলেছে, 'চোখ খারাপ হয়ে যাবে', 'পড়ার ক্ষতি হবে' 'মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে' তারাই এখন উল্টো বকুনি দিচ্ছে মোবাইলে মন না দেওয়ার জন্য। 'স্যার পড়াচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছ না?' 'ম্যাডাম কী হোমটাস্ক দিয়েছেন বুঝেছ তো?' সত্যিই এই সবুজ-অবুঝ ছোটর দল বুঝতে পারছে না কোনটা ক্লাস ওয়ার্ক আর

কোনটা হোমটাস্ক। সত্যিই উল্টোপুরাণ। আর এদিকে যে 'ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস/ ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস...'!

নব্য স্বাভাবিক শিক্ষা নিশ্চয়ই অনলাইনসর্বস্ব হয়ে উঠবে না তবে অনলাইন শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াও বোধহয় আর সম্ভব নয়। কম্পিউটার আর তথ্যপ্রযুক্তি যেমন আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে তেমনই অনলাইনও বোধহয় শিক্ষাক্ষেত্রে থাকার জন্যই এল। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া এক বড় পরীক্ষা প্রশ্নকর্তা-পরীক্ষক শিক্ষকের কাছে। এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর গুগল সার্চে মিলবে না, মুখস্থ করলে চলবে না। বই আর ইন্টারনেটের চাবিকাঠি তো পরীক্ষার্থী ছাত্রের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে। তাই এই ওপেন বুক পরীক্ষার যুগে এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে পরীক্ষার্থী তার অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করে মাথা খাটিয়ে সে-প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে। সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্যে থেকে সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তথ্য মনে রাখা নয়, যেন দরকার পড়ে ছাত্রের মেধা আর বিচারশক্তি। তথ্য মুখস্থ আর পরীক্ষার খাতায় তা বমি করার পরিবর্তে মগজনির্ভর প্রয়োগমূলক মূল্যায়নই কি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের দাবি ছিল না? বর্তমান অব্যবস্থায় এটাই কি একটা ভবিষ্যতের রূপালি-রেখা?

email:sabya4@gmail.com • M. 94333533349

পা ন্না মা নি

কঠিন পরিস্থিতি ও মানসিক স্বাস্থ্য

বর্তমানে আমরা অন্য একটি অভিনব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি। এইরকম বিরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকাটা যতটা প্রয়োজনীয় ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ মানসিকভাবে সুস্থ

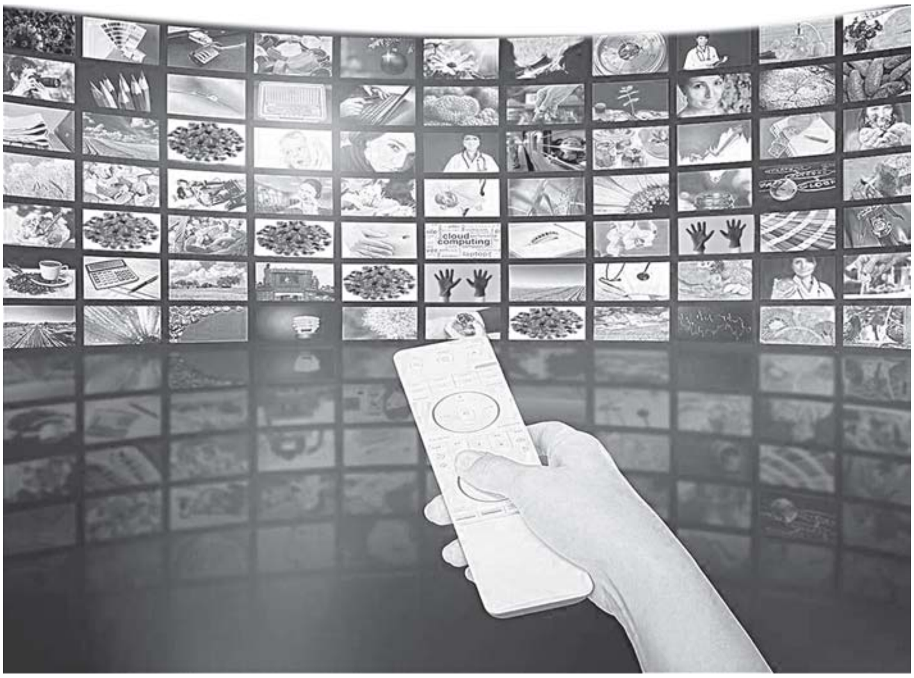

থাকা। আর সেইজন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের মত মানসিক স্বাস্থ্যেরও উপযুক্ত যত্ন নেওয়া উচিত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ একটি অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে আমাদের সমাজ জীবনে। এর সাথে সঠিক ভাবে মোকাবিলা করার জন্য সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি উচ্চ মানসিক অবস্থা এবং ইতিবাচক মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার জন্য অর্থাৎ মানসিক সুস্থতার জন্য অবশ্যই ভুল অথবা অসম্পূর্ণ তথ্য এড়িয়ে চলব। ভুল অথবা অসম্পূর্ণ তথ্য মনের মধ্যে অহেতুক ভীতি সৃষ্টি করে। সর্বদা ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য এবং গুজব থেকে নিজে এবং যতটা সম্ভব অন্যদের দূরে রাখতে হবে। ভিত্তিহীন কোন তথ্য, নিজে যাচাই না করে কখনই প্রচার করা যাবে না। এই ধরনের খবর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বা অন্য কোন উদ্বেগজনক খবর কখনই বেশি সময়ের জন্য দেখা বা পড়া উচিত নয়। নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে যথাসম্ভব কম সময়ের জন্য কোভিড-১৯ বা এইরকম উদ্বেগজনিত খবর দেখা বা পড়া যেতে পারে। টেলিভিশন বা অন্য কোন মাধ্যমে সবসময় সংবাদ পড়া বা দেখার পরিবর্তে পছন্দের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য সময় ব্যয় করা উচিত। এই ধরনের খবর এবং ভয়াবহতার চিত্র মনের মধ্যে উদ্বেগ ও ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে। কোন একটি খবর বা বিষয় উদ্বিগ্ন করে তুলেছে বা ভয় সৃষ্টি হয়েছে এমন চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকতে হবে, মনকে শান্ত রাখতে হবে। আনন্দের অনুভূতি আনে এমন সমস্ত ভাবনা মনে আনতে হবে। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বা অন্য কোন বিষয়ে, যে বিষয়গুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সেগুলি ভাববার পরিবর্তে যে সমস্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, সেগুলির উপর জোর দিতে হবে। স্বাভাবিক দিনচর্চা ও স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ আগের মতই বজায় রাখতে হবে। প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর পুষ্টিযুক্ত খাবার খেতে হবে, পর্যাপ্ত পানীয় গ্রহণ করতে হবে, পর্যাপ্ত ঘুম এবং পছন্দের উপভোগ্য জিনিসগুলিই দিনচর্চার মধ্যে রাখতে হবে। যেমন যোগ ব্যায়াম, ঘরেই সম্ভব এমন খেলা, গান করা, গান শোনা, বই পড়া বা অন্য পছন্দের কিছু। অবসর সময়ে আঁকা, সেলাই করা, বাগান করা, টবে গাছ লাগানোর মত শখের বিষয়গুলি পরিপূর্ণ করার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দিনচর্চা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতা দুইই সমানভাবে বজায় থাকে।

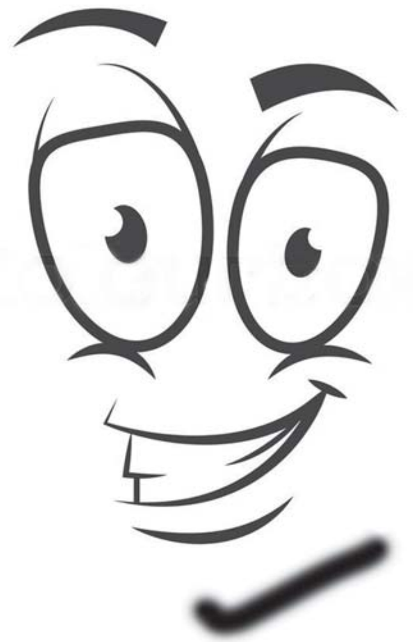

কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্বব্যাপী এর মোকাবিলায় সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। এর ফলে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে বা মানসিক স্বাস্থ্য যত্ন নিতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে অনবরত যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। যেকোন বিষয়ে মত বিনিময় বা আলোচনা করা উচিত।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন সামাজিক পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিকে খানিকটা কর্মবিরতি বা অবসর সময়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় যেভাবে সম্ভব নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতে হবে, সর্বদা কাজের মধ্যে থাকতে হবে, সর্বক্ষণ শারীরিক ভাবে সক্রিয় (Active) থাকতে হবে। নেতিবাচক আবেগে না গিয়ে ইতিবাচক ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। সবসময় ইতিবাচক বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যদের যেভাবে সম্ভব সাহায্য করতে হবে, সেটা শ্রম দিয়ে হতে পারে অথবা অন্য যে কোন ভাবে হতে পারে। মানসিক অস্থিরতা, চাপ বা উদ্বেগের বিষয় নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করে একে অন্যের সাথে বিনিময় করতে হবে। এতে উভয়েই মানসিক ভাবে সমৃদ্ধ ও মানসিক চাপ থেকে হালকা হতে পারা যাবে। অপেক্ষাকৃত ছোটদের জিজ্ঞাসা নিবারণে সাহায্য করতে হবে। কোভিড-১৯ তথা অন্য কোন বিষয়ে তথ্য বা কোন খবর সহজভাবে বোঝাতে হবে ছোটদের। তাদের আশ্বস্ত করতে হবে। মানসিক ভাবে সবল করতে হবে তথা মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ রাখতে হবে। প্রত্যেককে নিজেকে যেমন মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হবে, ঠিক তেমনই প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজন সকলের মানসিক পরিস্থিতির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মানসিক সমস্যাগুলি শনাক্ত করে সেগুলি নিরসন করে মানসিক ভাবে সুস্থ করে তুলতে হবে। কোভিড-১৯ বা অন্য কোন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সুস্থতা দুইই সমানভাবে যত্ন নিতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—UNICEF

email:mani7777pannalal@gmail.com
• *M. 8100216574*

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও তাঁর স্বাস্থ্যবিধির তত্ত্ব

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ছিলেন বিশ্বে নার্সিং (সেবা-শুশ্রূষা), হেল্‌থ্ কেয়ার (স্বাস্থ্য-পরিষেবা), হাইজিন (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান) এবং সামগ্রিক ভাবে স্যানিটেশন (স্বাস্থ্যবিধি)-এর তত্ত্বীয় এবং প্রায়োগিক নিয়মকানুনের পথিকৃৎ।

নাইটিংগেলের জন্ম ১৮২০ সালের ১২ মে ইটালিতে। ছোটবেলা থেকেই মানুষের সেবা করা, মানুষকে ভালোবাসা, অসুস্থ রোগীদের শুশ্রূষা করা ছিল তাঁর নেশার মতো। মানুষের দুঃখকষ্ট দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাই ঠিক করে ফেললেন বড় হয়ে এই পরিষেবাকেই তিনি পেশা করবেন। এতে তাঁর বাবা-মায়ের মত ছিল না, কারণ সেযুগে এই নার্সিং পেশাকে সমাজ খুবই ছোট নজরে দেখত।

তবুও তিনি নার্সিং পেশাকেই গ্রহণ করলেন এবং যোগ দিলেন ব্রিটিশ মিলিটারিতে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা করবেন বলে। মনে রাখতে হবে, নাইটিংগেল অসুস্থ মানুষকে সেবা করবার সময় সর্বদাই বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করতেন। তিনি মনে করতেন ব্যক্তি-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (হাইজিন) মেনে চললে এবং সার্বিকভাবে রোগ প্রতিরোধের (প্রিভেনশন) সমস্ত বিধিগুলিকে মেনে চললে অধিকাংশ রোগ থেকেই মুক্তি পাওয়া যায়, সমাজ রোগমুক্ত হয়। তাঁর এই দর্শনই কালে কালে বিশ্বের সমস্ত হাসপাতালের আদর্শ হয়ে দাঁড়াল।

তাঁর সেই যুগান্তরকারী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত পরিবেশ তত্ত্বের দশটি বিধি ছিল এইরকম ঃ—

১) ভেন্টিলেশন (বায়ু-চলাচল) ও উষ্ণতা
২) আলোক
৩) শব্দের কম তীব্রতা
৪) বাড়ি এবং হাসপাতাল ভবনের স্বাস্থ্যবিধি
৫) খাট, বিছানা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা
৬) বৈচিত্র্য ও চিত্তবিনোদন
৭) ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
৮) স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয় জল
৯) রোগীদের আশ্বস্ত করা ও কাউন্সেলিং
১০) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা লিপিবদ্ধ করে রাখা

নাইটিংগেল মনে করতেন, বিশ্বাস করতেন, এইগুলি সবই একেবারে মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি, যা যথাযথ মেনে চললে অধিকাংশ রোগকেই নির্মূল করা সম্ভব।

বাস্তবিক অর্থে, ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে দিনরাত কাজ করবার সুবাদেই শুরু হয়েছিল তাঁর এই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আন্দোলন। এই যুদ্ধের সময় তিনি আরও ৪০ জন দক্ষ, প্রশিক্ষিত সহযোগী সেবিকাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের একেবারে সামনে থেকে নিরন্তর কাজ করে চলেছিলেন।

তিনি লক্ষ করলেন, যুদ্ধে প্রায় ৪০০০ সৈন্য নিহত হয়েছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণে আর গবেষণায় জানা গেল—এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র ১০ শতাংশ মারা গেছেন যুদ্ধঘটিত আঘাতজনিত কারণে আর বাকি ৯০ শতাংশ সৈন্য মারা গেছেন নানান রোগ সংক্রমণে অর্থাৎ টাইফয়েড, টাইফাস, কলেরা, স্কার্ভি এবং উদরাময় রোগে।

এবার তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং হাতে হাতে ফলও পেলেন, মৃত্যুর হার ৪২ শতাংশ থেকে নামিয়ে আনলেন ২ শতাংশে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, তিনি চালু করলেন হাত-ধোওয়া, যা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ কাজের কথাকে স্মরণে রেখে ইংলন্ডের কবি ওয়াডস্‌ওয়ার্থ লঙফেলো ১৮৫৭ সালে লিখলেন ঃ

"Lo! in that hour of misery
A lady with a lamp I see
Pass through the glimmering gloom,
And flit from room to room.
And slow, as in a dream of bliss,
The speechless sufferer turns to kiss
Her shadow, as it falls
Upon the darkening walls."

"তাকিয়ে দেখো দুখের রাতে
হেরিনু সেই নারী প্রদীপ হাতে
মিটমিট জ্বলে থাকা। ঈষদন্ধকারে
নিঃশব্দে চলাফেরা ঘর থেকে ঘরে
স্বপ্নের মতো পরম সুখটি পায়
মুক আর্তেরা, যবে চুম্বন ধেয়ে যায়
তাঁর কায়ার ছায়া ঐ যে পড়ে,
ঘনান্ধকার দেওয়ালগুলির 'পরে।" (বঙ্গানুবাদ লেখকের)

হ্যাঁ, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকেই কবি অভিহিত করেছিলেন 'A lady with a lamp' নামে।

১৮৬০ সালের ৯ জুলাই তিনি সেন্ট টমাস হাসপাতালে বিশ্বখ্যাত 'নাইটিংগেল ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা করলেন, যা সেযুগে সেবাশুশ্রূষার কর্মকান্ডে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

ভারতের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও নাইটিংগেল ভেবেছেন তো বটেই, এমনকি উদ্বিগ্নও ছিলেন এদেশের সৈনিকদের অসুস্থ শরীরের কথা ভেবে। আর এই কারণেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন "The Sanitary State of the Army in India" নামের একটি পুস্তক ১৮৬৩ সালে। ১৮৬৪ সালে আবার একটি ছোট বই রচনা করলেন "How People may Live and not Die in India"। এতেও তিনি থেমে থাকেননি, আরও একটি পুস্তিকা লিখলেন ভারতের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে ১৮৭৪ সালে, "Life and Death in India"।

এই মহিয়সী নারীর জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজ বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। কেন যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি, তা আজও বিস্ময়কর। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবনাবসান ঘটে যায় ১৯১০ সালে ১৩ আগস্ট লন্ডনে। তাঁর দ্বিশতজন্মবর্ষে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

email:sankarku_nath@yahoo.co.in • M. 9433309056

ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু

করোনা-কুসংস্কার—গোমূত্র, ৩৩ কোটি দেবতা ইত্যাদি

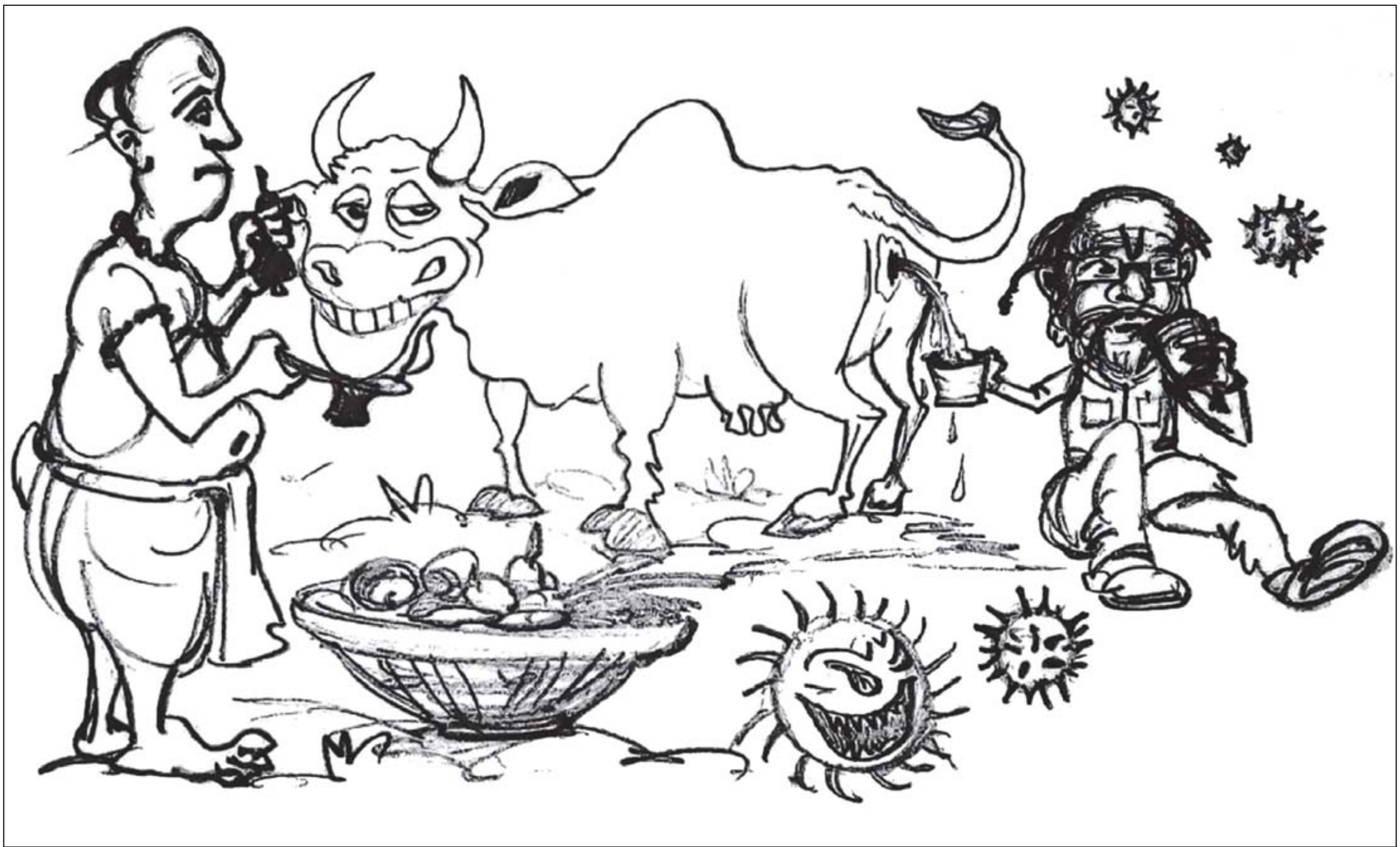

সম্পূর্ণ অজানা নোভেল করোনা ভাইরাস-১৯-এর বিশ্বব্যাপী সংক্রমণে মানবসমাজ এক অভাবিত অভূতপূর্ব সঙ্কটে পড়েছে। এই 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে' অন্যান্য বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮, ১৯৪০-৪৫) বা অতিমারী-মহামারী (যেমন ১৭২০-এর প্লেগ, ১৮২০-এর কলেরা, ১৯১৮-১৯২০-এর স্প্যানিশ ফ্লু) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি চিত্র দেখা গেল। এই প্রথম দেখা গেল মন্দির-মসজিদ-গির্জা সহ সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান বা জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের কাজকর্ম—এ সবের মত অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকান্ড সম্পূর্ণ বন্ধ। এবং তাতে কারোর কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু অতন্দ্র জেগে নিরন্তর কাজ করে চলেছে বিজ্ঞান—একদিকে গবেষক, বিজ্ঞানীরা, অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা।

কিন্তু তাই বলে কিছু মানুষের অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ কাজকর্ম বন্ধ হয়নি। করোনাকে ঘিরে প্রকাশ পাচ্ছে নানা ধরনের কুসংস্কার। এর একটি যেমন গোমূত্র খেয়ে করোনা ভাইরাস ডিজিজ-১৯ (কোভিড-১৯) আটকানো, এমনকি সারিয়ে দেওয়ার দাবি। আর ব্যাপারটি আমাদের দেশে মূলত ঘটাচ্ছে যারা গরুকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে এই 'গোমাতার' সব কিছুর মধ্যেই অলৌকিকত্ব আরোপ করে। অবশ্য পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ছাড়া নাইজেরিয়া, নেপাল ও মায়ানমার-এ ও নানা রোগের চিকিৎসায় গোমূত্রের ব্যবহার আছে। আয়ুর্বেদে আবার গর্ভবতী গাভির মূত্রের ঔষধগুণের কথা বলা হয়েছে। যাইহোক করোনা-র অতিমারির সময় দেখা গেল 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা' দিল্লিতে আয়োজন করেছে 'গোমূত্র পার্টি'-র। বেশ কয়েক শ' মানুষ লক ডাউন উপেক্ষা করে তা খেয়েছে। দেশের নানা স্থানে বোতলে ভরে চড়াদামে গোমূত্র বিক্রি হয়েছে। ঝাড়গ্রামের একজন তো তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হলেন। গোমূত্র যে করোনার চিকিৎসায় কোন কাজে লাগে না, তাও প্রমাণিত। শুধু এটি থেকেও যে, সত্যিই তা হলে এদ্দিনে ভারতে গোমূত্রকেই কাজে লাগিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলা করোনার আক্রমণ ও মৃত্যু আটকানো যেত।

মল-মূত্র প্রাণীর শরীরের বর্জ্য-রেচন পদার্থ অর্থাৎ বিপাকীয় ক্রিয়ার পর যেসব অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর জিনিষ তৈরি হয় ও পড়ে থাকে তা শরীর থেকে বের করার প্রধান প্রাকৃতিক উপায় হল মল ও মূত্র ত্যাগ। তাই তাকে আবার শরীরের মধ্যে গ্রহণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। ওষুধ হিসেবে তো নয়ই।

মানুষ বা গরু—সাধারণভাবে খাদ্যাভাসের পার্থক্যের কারণে কিছু তফাৎ ঘটে। যেমন সাধারণভাবে আমাদের প্রস্রাবের শতকরা ৯১-৯৬ ভাগই জল। বাকি অংশের সিংহভাগ জুড়ে থাকে বিপাকীয় ক্রিয়ায়

বেরোনো নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, যেমন ইউরিয়া (শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ), ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এগুলির অত্যধিক মাত্রা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ও প্রাণঘাতী রোগের পরিচায়ক। তাই এদের মূত্রের মাধ্যমে বের করে দিতে হয়। স্পষ্টত তা আবার মূত্রের মাধ্যমে পান করলে বিপদ বাড়ে। এছাড়া থাকে সামান্য পরিমাণে কিছু জৈব ও অজৈব পদার্থ, প্রোটিন, হরমোন, ইউরোবিলিন (যার জন্য প্রস্রাবের রঙ হয় হলুদাভ)। তবে এটি ঠিকই বাঘ-সিংহের মত মাংসাহারী প্রাণী প্রস্রাবের চেয়ে গরু-ছাগল-ভেড়া—মহিষের মত শাকাহারী প্রাণীর প্রস্রাবে নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান কিছু কম থাকে, এবং এক্ষেত্রে গোমূত্রের আলাদা কোন মাহাত্ব নেই—সর্বভুক মানুষ থেকে শুরু কর অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর ক্ষেত্রেও তা সত্য।

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ বর্জ্য পদার্থের কারণে প্রাণীর মূত্র প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন-চক্র স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এ কারণে একে সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এবং তা করা হয়ও। আর এইভাবে এই জৈবসারের সুষ্ঠু ব্যবহারের সাহায্যে কৃত্রিম ইউরিয়ার সার হিসেবে ব্যবহার কমানো সম্ভব। এছাড়া গান পাউডার বানানো, চামড়ার ট্যানিং, জামাকাপড় রঙ করার এবং ঘর মোছার জন্যও মূত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রের গোমূত্র বলে নয়, অন্যান্য প্রাণীর মূত্রও একইভাবে কার্যকরী। অনেক প্রাণী আবার নিজেদের মূত্রকে নিজেদের এলাকার সীমা নির্ধারণ করার কাজে ব্যবহার করে, যেমন গন্ডার, বাঘ ইত্যাদি। কিন্তু কোন প্রাণীই শখ করেই হোক বা নিজেদের রোগ সারানোর জন্যই হোক নিজেদের বা অন্য কারোর মূত্র সাধারণভাবে পান করে না। একমাত্র ব্যতিক্রম—সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষদের মধ্যকার নির্বুদ্ধি কিছু মানুষ। এরা ডায়াবিটিস, ক্যান্সার ইত্যাদি সারানোর নির্বোধ আশায় নিজেদের মূত্র যেমন পান করে (শিবাম্বু!), তেমনি গোমাতার 'পবিত্র' মূত্রকেও নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে—কখনো চামড়ায় লাগিয়ে, কখনো খেয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোমাতার নিজের সন্তানসন্ততিরা অর্থাৎ বাছুরেরা তা খায় না।

গর্ভবতী স্ত্রী স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রে বিশেষ কিছু হরমোন অতি সামান্য পরিমাণে থাকে (যেমন করিওনিক গোনাডোট্রফিন, প্রজেস্টেরন ইত্যাদি)। এর থেকে ঐ হরমোন নিষ্কাশনের চেষ্টা চললেও এখনো তা ব্যবসায়িকভাবে সম্পূর্ণ সফল নয়। তবে তা খেলে ঐ হরমোন শরীরের বিশেষ কোন কাজে লাগে না, উল্টে বিপত্তি ঘটে অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ শরীরে ঢোকার জন্য। তাই প্রাচীন আয়ুর্বেদে গর্ভবতী গরুর মূত্রের ওষুধি গুণের কথা বলা হলেও, তা এখনো বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। তবু একসময় তা করা হত। যেমন পুরনো কিছু ছবিতে দেখা যায় গরুর প্রস্রাবদ্বারের নিচে অসুস্থ মানুষকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, যাতে প্রস্রাব সরাসরি তার শরীরে ও মুখে পড়ে। আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় গোমূত্রে তামাক পাতা, রসুন, পেঁয়াজ, লেবুর রস, পাথরের গুড়ো ইত্যাদি মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে একটি 'পদার্থ' (কাউ ইউরিন কন্‌কক্‌শান, CUC) বানানোর পদ্ধতি প্রচলিত। শিশুদের খিঁচুনি সহ নানা রোগের চিকিৎসায় একে ব্যবহার করা হত। প্রায় ৪০ বছর আগে এর প্রয়োগে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটার পর এ নিয়ে কিছু গবেষণা হয় এবং সেগুলি 'অ্যাফ্রিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সায়েন্স'-এ প্রকাশিত হয়। এগুলি থেকে জানা যায় ঐ পদার্থে ফিনাইল অ্যাসেটিক অ্যাসিড, থাইমল, নিকোটিন সহ নানা পদার্থ থাকে। গবেষণায় দেখা যায় এই 'পদার্থের' প্রয়োগে শিশুদের মস্তিষ্কে শ্বাসকেন্দ্র স্তিমিত হয়, হৃদযন্ত্র ও নার্ভতন্ত্র বিকল হতে থাকে এবং এইভাবে মৃত্যু ঘটে। আলাদাভাবে এটি এবং শুধু গোমূত্র দিয়েও দেখা গেছে, কোনটিই শিশুদের খিচুনির মত নানা রোগে এবং এমনকি স্ট্রিকনিন দিয়ে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা খিঁচুনিতেও আদৌ কার্যকরী নয়, বরং বিপজ্জনক, বিশেষত প্রথমটি।

আসলে খিঁচুনি বা করোনা—কোন ক্ষেত্রেই গোমূত্রের কোন ভূমিকা থাকা সম্ভব নয়। তবু তর্কের খাতিরে এ নিয়ে খোলামনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা যেতে পারে। কিন্তু কখনোই এই গবেষণা এদেশে কুসংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। তাতে প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অর্থহীন গবেষণার চেয়ে গবেষণার অভিমুখ কার্যকরী দিকেই পরিচালিত হওয়া উচিত।

গোমূত্রের মত করোনাকে ঘিরে আরো নানা কুসংস্কার ও মিথ্যা বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়েছে। যেমন ২৭ মার্চ (২০২০) এক সাংসদ বলেন, 'করোনা আমাদের কিছু করতে পারবে না, কারণ আমাদের ৩৩ কোটি দেবতা আছে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ দিন ভারতবর্ষে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯১৮ ও মারা গেছিলেন ২০ জন। আর একমাস পরে ২৭ এপ্রিল ভারতের আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল

২৮৯৮০ এবং মৃত ৮৮৬ এবং এর ১০ দিন পর ৭ মে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৫২, ৯৫২ ও ১৭৮৪। অর্থাৎ ৩৩ কোটি 'দেবতা' থাকা সত্ত্বেও করোনা হু হু করে বেড়েই চলেছে। এদেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষও জানেন ঐভাবে 'দেবতায়' বিশ্বাস করলেও তারা আসলে কিছু করে না, করতে হয় মানুষকেই।

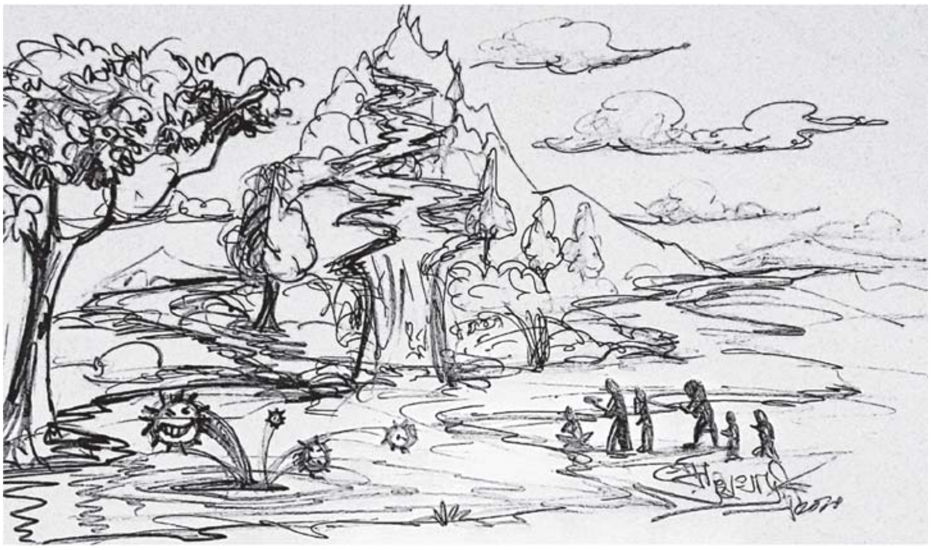

কিন্তু এই ধরনের কুসংস্কারকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দেখা যায়। যেমন গঙ্গাজল প্রসঙ্গে। খ্রিস্টানদের যেমন জর্ডান নদীর জল, মুসলিমদের কাবার পাথর ছোঁয়ানো জল, তেমনি হিন্দুরা গঙ্গাজলকে পবিত্র অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মনে করে। কিন্তু একে ঘিরে বস্তাপচা কিছু গালগল্প এখনকার মানুষ নেবে না, তাই দরকার 'বিজ্ঞানের' মুখোশ পরানো। এ কারণে কিছু লোক করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে গঙ্গাজলকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় মেতেছে। লকডাউনে সব কারখানা বন্ধ থাকায় দূষিত বর্জ্য গঙ্গায় অনেক কম পড়ছে। তাই গঙ্গা অনেক নির্মল হয়েছে—এটি বাস্তব সত্য। কিন্তু 'অতুল্য গঙ্গা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রস্তাব দিয়েছে, গঙ্গার জলে থাকে নিনজা ভাইরাস, যা এক ধরনের ব্যাকটেরিওফাজ, আর তাই এটি করোনা ভাইরাসকেও মারতে পারে। তারা সরকারি দপ্তরে প্রস্তাব দিল এ নিয়ে গবেষণার। সরকারি দপ্তর তা পাঠালো 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' (আই সি এম আর)-কে। কিন্তু আশার কথা 'আই সি এম আর' তা আপাতত নাকচ করে দিয়েছে। (৮ মে-র সংবাদ)

আসলে তো গঙ্গাজল বলে নয়, যে কোন বহমান নদী বা খালের জলে এই বহমানতা এবং সঙ্গে জলে রোদ পড়ার কারণে জীবাণু বেশি থাকতে পারে না। জল-দূষণ কম হলে সবার জলই নির্মলতর হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে গঙ্গাজলের আলাদা কোন মাহাত্ম্য নেই। তবু শুধু গঙ্গাজলকে নিয়ে গবেষণার প্রস্তাবের পেছনে কাজ করে এ সম্পর্কিত পবিত্রতার ধারণা। অন্যদিকে ঐ ধরনের ব্যাকটেরিওফাজ শুধু গঙ্গাজলেই নয়, অন্য যেকোন নদীর জলেই থাকতে পারে। তবে সেটিও এই কোভিড-১৯ রোগটির নোভেল করোনা ভাইরাসকে মেরে ফেলবে, তা দূর কল্পনার ফসল। আর এই কারণে 'আই সি এম আর'ও এমন 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর' মত কাজে যায়নি।

কেউ বলল 'ফোকাসড' আলোয় ভাইরাসের 'হৃদপিন্ড' ভেঙ্গে পড়বে। কেউ বলল, রাত ৯ টায় হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে করোনা ভাইরসের 'রেটিনা নার্ভ' বিপন্ন হয়ে তা নিশ্চিহ্ন হবে। কেউ বলল, করোনা ভাইরাস বেশি তাপে বাঁচে না। তাই ১৩০ কোটি ভারতবাসী মোমবাতি জ্বালালে তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি (সবই ৯!) সেলসিয়াস বেড়ে যাবে আর ভাইরাস মরে যাবে। (তবে দুঃখের বিষয়, করোনা ভাইরাসকে মারতে কমপক্ষে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা প্রয়োজন। অন্যদিকে সবাই মোমবাতি জ্বালালেও দেশের তাপমাত্রা একডিগ্রিও বাড়বে না। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আই এম এ)-এর প্রাক্তন সভাপতি জনৈক ডা: আগরওয়ালও বলেছিলেন, ঐ ৫ তারিখে সবাই যদি একসঙ্গে ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভাবে তবে তা শরীরে বাসা বাঁধতে পারবে না। এমনই আরেক হাস্যকর যুক্তি ছিল যে, ঐদিন রাত ৯ টায় নাকি পৃথিবীর বিশেষ চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। এর ফলে শিলনোড়া শিলের উপর দাঁড়িয়ে থেকেছিল। এমন ছবিও ভাইরাল হয়েছে। (ক্যামেরার কারিকুরি!) কিন্তু শিল ও শিলনোড়ার পাথর যে লোহার মত চুম্বক দিয়ে আকর্ষিত হয় না, এমন সাধারণ তথ্যটুকুও তাদের জানা নেই।

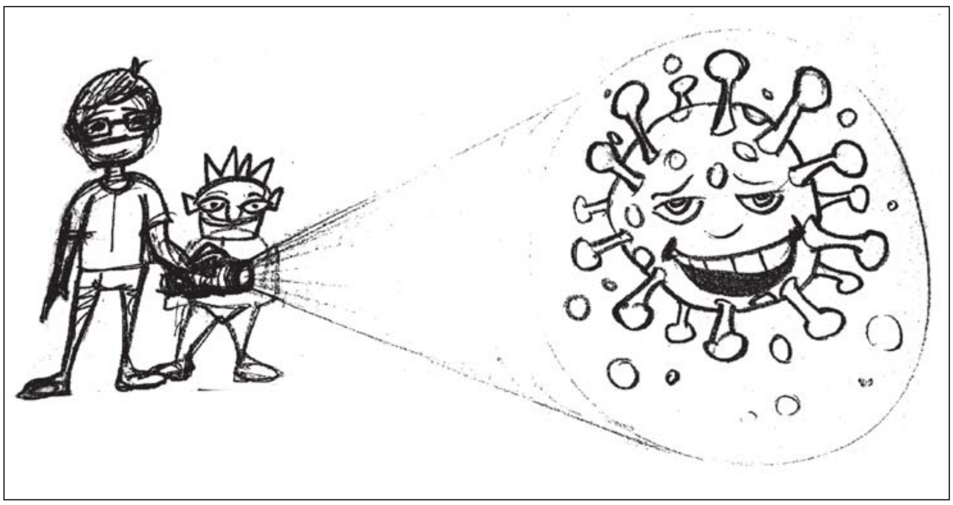

এইভাবেই কোভিড-১৯ লকডাউন শুরু হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন কাঁসর ঘন্টা, শাঁখ ইত্যাদি বাজিয়ে চিকিৎসা কর্মীদের উৎসাহ

দিতে। এর 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা দেওয়াও শুরু হল। এই আচমকা শব্দতরঙ্গ নাকি করোনা ভাইরাসকে মেরে ফেলবে। শব্দতরঙ্গ দিয়ে যে ভাইরাস-কে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব—তা কিন্তু সত্যি। তাও দুঃখের বিষয় পোলিও ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে লাগে ৪-৫ লক্ষ হার্ৎজ শব্দতরঙ্গ, ইনফ্লুয়েঞ্জা (টাইপ-১) ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয় ৭ লক্ষ হার্ৎজ শব্দতরঙ্গে। তাও অন্তত এক ঘন্টা প্রয়োগ করে। কিন্তু ঐভাবে শাঁখ কাসর বাজিয়ে তৈরি হয় মাত্র কয়েক হার্ৎজ শব্দতরঙ্গ—লক্ষ দূরের কথা, কয়েক হাজারও নয়।

মার্চের ২৭ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের একটি চিঠি থেকে জানা গেল, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ঝড়েশ্বর শিবঠাকুর নাকি স্বপ্নে বলেছেন স্নান করে গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে গোবর দিয়ে তুলসীতলা পরিষ্কার করার পর ঐ জায়গায় মাটি খুঁড়ে যে কয়লা পাওয়া যাবে তা কপালে টিপ করে পরলে করোনা ভাইরাস 'বাপ বাপ' বলে পালাবে। বহুজন নাকি গভীর বিশ্বাসে ঐ টিপ পরে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দুঃখের বিষয় এতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আটকায়নি, তার সম্ভাবনাও নেই।

কিছু মুসলিম আবার বলছিলেন, আমরা তো হাজি আর নামাজি, আমাদের করোনা কিছু করতে পারবে না। আউটডোরে কিছু মুসলিম রোগির মুখ থেকেও এমন কথা স্বকর্ণে শোনা। কিন্তু মক্কায় হজে গিয়ে পুণ্য করলে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে করোনা ভাইরাস তাকে চিনতে পেরে ছেড়ে দেবে এমনটি হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। দিল্লির নিজামুদ্দিনে জড়ো হওয়া ধর্মপ্রাণ তবলিগিদের অনেকেই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছে, আরো অনেকের মধ্যে ছড়িয়েছেন। বিভিন্ন রোগের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া একদিক থেকে মানুষের চেয়ে 'সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারি'—তারা ধর্মনিরপেক্ষ। তারা কারোর ধর্ম চিনে বা 'পাপপুণ্য' মেপে হত্যা করে না বা ছাড় দেয় না।

করোনার মোকাবিলায় নানা ধরনের অবৈজ্ঞানিক, অপ্রমাণিত, মিথ্যা বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসা ও কাজকর্মও করা হয়েছে। বারাসতের ২৮ নং ওয়ার্ডে যেমন ৩ মে করোনার প্রতিরোধে 'করোনা যজ্ঞ' করা হয়েছে। উদ্যোক্তার ভাষায় 'ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে নবগ্রহ পূজা, হোমযজ্ঞের মাধ্যমে করোনা অশুভ শক্তির বিনাশ করা হল।' করোনার আদলে কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস বা ঐ পূজা ও যজ্ঞ যে এই ভাইরাসকে আটকাতে পারে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা হয়নি, হওয়ার কথাও নয়, নাহলে বারাসত সহ উত্তর ২৪ পরগনাকে দীর্ঘদিন ধরে করোনা সংক্রমণের হটস্পট হিসেবে থাকতে হত না। করোনা ভাইরাস তাড়াতে উড়িষ্যার বান্ধাহুড়ায় নরবলিও দিল পুরোহিত। (২৯ মে-র সংবাদপত্র)।

এদেশের কিছু লোক (এবং চিকিৎসক) আবার আয়ুর্বেদ আর হোমিওপ্যাথির মাহাত্ম্য করোনা প্রসঙ্গে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। এসব নিয়ে গবেষণা করা যেতেই পারে। বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে পরোক্ষভাবে কোভিড-১৯-র মোকাবিলা করার কথাও বলা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ ছাড়া কোন দাবি, যাগযজ্ঞ করার মতই ব্যাপার। দেখা গেল হোমিওপ্যাথি

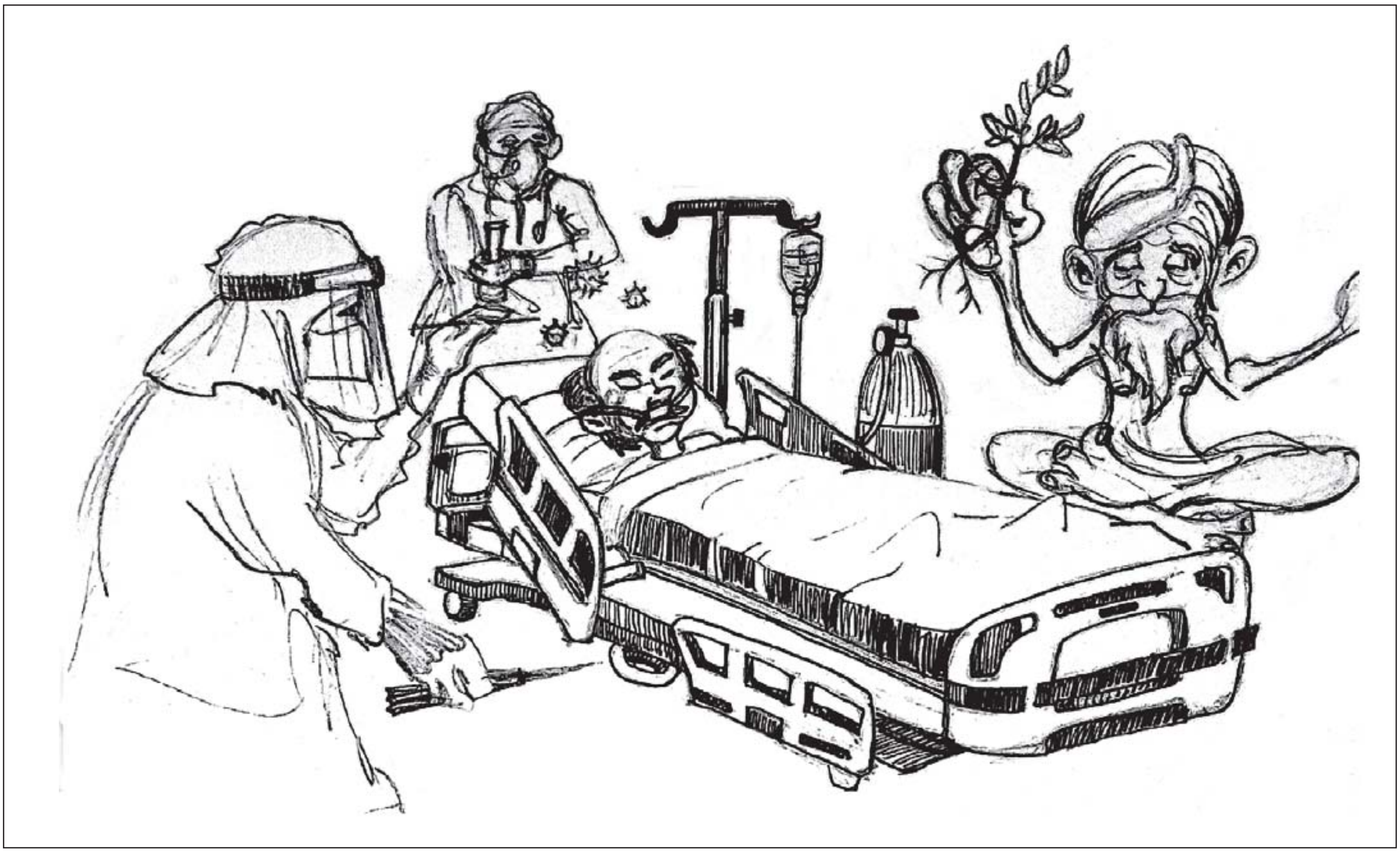

ওষুধ আর্সেনিকাম অ্যালবাম—৩০ ওষুধকে কার্যকরী বলে প্রচার করা হল, সরকারিভাবে পুরসভার পক্ষ থেকে তা বিনামূল্যে খাওয়ানোও হল। কিন্তু কোন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছাড়া এ ধরনের ওষুধকে এইভবে হাজির করা আরেক ধরনের কুসংস্কার। বহু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও এর বিরোধিতা করেছেন। (৪ মে-র সংবাদপত্র) আরো একধাপ এগিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী শ্রীমদ নাইক দাবি করলেন, ইংল্যান্ডের যুবরাজ চার্লস, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠেছেন। যুবরাজ চার্লসের দপ্তর থেকে এমন মিথ্যা দাবির বিরোধিতা করে বিবৃতি দিতে হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, তিনি ব্রিটেনের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাতেই সুস্থ হয়েছেন। (৫ মে-র সংবাদপত্র) জানা গেছে নোভেল করোনা ভাইরাস-১৯-এর উৎসস্থল চিনেও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি আকুপাংচার, চাইনিজ হার্বাল মেডিসিন, ছিকুং-এর মত শ্বাসের ব্যায়াম তথা ট্রাডিশন্যাল চাইনিজ মেডিসিন (টি সি এম) বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কখনো এমন দাবি করা হয়নি যে এর ফলেই কোভিড-১৯ সেরে যাবে বা আটকানো যাবে।

একইভাবে ১ মে-র সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ী, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা স্পষ্টই জানিয়েছে যে, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন কোভিড-১৯-কে নিরাময় বা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। এরপরও এই ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি মে মাসের ১২ তারিখে বাইরের রাজ্য থেকে হাওড়ায় আসা যাত্রীদের হাতে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নির্দেশিকার পাশাপাশি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেটও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হু-র মতে অপ্রমাণিত এমন একটি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিন্তু যথেষ্ট (১৩ মে-র সংবাদপত্র)। এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটেছে। ল্যানসেট-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এই ওষুধের কারণে মৃত্যুও ঘটেছে। তাই 'হু' এ নিয়ে মানুষের শরীরে পরীক্ষা বন্ধ করতে বলেছে।

করোনাকে ঘিরে এমনই নানা ধরনের কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা অজস্র সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি করোনা অতিমারির আগে সৃষ্টি হওয়া কুসংস্কারগুলির অসারত্বও প্রতিষ্ঠা করছে। এ নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুকে বেশ সুন্দর কিছু মন্তব্যও দেখা গেছে। যেমন, 'যদি বেঁচে যাও এবারের মত, যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়'। জেনো বিজ্ঞান লড়েছিল একা, মন্দির মসজিদ নয়। কিবংং 'ধর্ম এখন ছুটিতে আছে, বিজ্ঞান এখন ডিউটি করছে'। ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান, পূজা ইত্যাদি বন্ধ হওয়ার ফলে কোন ক্ষতি হয়নি। করোনা প্রতিরোধে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই অন্যান্য জমায়েত করার মত ও শারীরিক দূরত্ব (ফিজিক্যাল ডিস্টান্সিং) বজায় রাখার জন্য সরকারিভাবে ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটি জানা যেত যে, হরিনাম নিয়ে দলবেঁধে খোলকর্তাল বাজিয়ে নাচলে বা রামনবমীর মত অনুষ্ঠানে ভিড় করে পূজা করলে, মসজিদে গাদাগাদি বসে নামাজ পড়লে বা গির্জায় প্রার্থনা করলে, করোনা ভাইরাসকে আটকানো যাবে, তবে মানুষকে তাইই করতে বলা হত। কিন্তু দলবেঁধে ধর্মানুষ্ঠান করা, বাজার করা, আড্ডা দেওয়া—করোনা প্রসঙ্গে একই গোত্রের অর্থাৎ ক্ষতিকর।

অন্যদিকে এটিও প্রমাণিত হচ্ছে যে, জ্যোতিষী বা তান্ত্রিকদের হাজারো কাজকারবার ও বাগাড়ম্বর সম্পূর্ণ অর্থহীন। অমুক জুয়েলার্স, তমুক আশ্রমে বসে ব্যবসা করা কোন বিশাল বিশাল শাস্ত্রীজি জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে তাদের খদ্দেরদের সম্পর্কে এমন করোনা সম্পর্কিত বিপদের কোন ভবিষ্যৎবাণীই করতে পারেনি। কোন রত্ন পাঠিয়েও খদ্দেরদের কর্মহীনতা, রোগভোগ আর করোনা জনিত দুর্ভোগের সামান্যতম উপশম করতে পারছে না। নির্ভর করতে হচ্ছে চিকিৎসক, সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাদির উপর। তিন মিনিটে ১০০ ভাগ গ্যারান্টির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হাজারো তান্ত্রিক বাবাজি-মাতাজির যাবতীয় ভন্ডামিও এখন বন্ধ।

মাতৃরূপী প্রকৃতিকে লাঞ্ছনা করা বন্ধ করলে সে কিভাবে নির্মল হয়ে উঠে আমাদের সুস্থ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও ভোগবাদ আর মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অপরিমেয় লোভ ও ক্ষমতালিপ্সা কিভাবে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে চরমতম দুর্দশায় ফেলতে পারে তা কোভিড-এর এই বিশ্বজোড়া অতিমারী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। একই সঙ্গে তা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের গুরুত্ব এবং তথাকথিত ঈশ্বর, ঈশ্বর বিশ্বাসকেন্দ্রিক নানা ধর্ম, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ও ঐ বিশ্বাসকেন্দ্রিক নানা ধরনের কুসংস্কারের অসারত্ব।

email:sahoo23319536@gmail.com • M. 8777598939

খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে

"বিশ্বের ত্রাস : নভেল করোনা ভাইরাস"

লেখক : অজয় মজুমদার

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা

সৌরভ মুখার্জী

কার্টুন

রজত কুণ্ডু

চ্যালেঞ্জ কোভিড নাইনটিন

এইতো সুযোগ তন্ত্রবাবা
দেখাও মন্ত্রশক্তি
যন্ত্রণাময় বিশ্ববাসী
করবে ভীষণ ভক্তি।

বশীকরণ মন্ত্র নাকি
কবচ দেবে দেশকে
বিজ্ঞান না মন্ত্র তোমার
বলবে কথা শেষ কে!

তাড়াও দেখি মহামারী
ব্যাধি কোভিড নাইনটিন
পঞ্চবাণ চালাও তুমি
নিদেন পক্ষে জিন টিন

পারবে নাতো কিছুই তুমি
বলবে শুধুই গ্রহের খেল
তবে কেন সাধুর বেশে
ভাঙছ সবার মাথায় বেল!

প্রযুক্তি আর যুক্তি নিয়েই
মানুষ বরং বেঁচে থাক
যত আছে ভন্ডবাবা
মন্ত্র নিয়ে চুলোয় যাক।

পরিবেশ ডট কম
পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পরিবেশ ডট কম

বাংলা ভাষায় পরিবেশ ও বিজ্ঞানের
একমাত্র চ্যানেল ও পোর্টাল

Mobile - 9051222813
Email - poribesnews@gmail.com
Website - www.poribes.com

সন্দীপ সাহার আলোকচিত্র নিবন্ধ : করোনার কোলকাতা

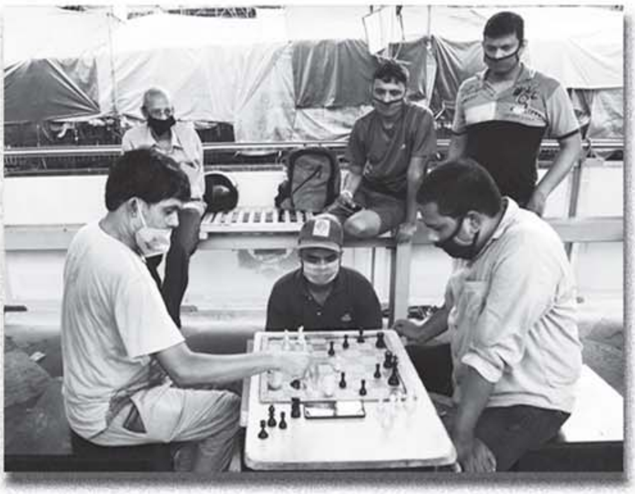

মাস্ক পরুন
SLOW DRIVE
প্রাণে বাচুন
দুরত্বে থাকুন
ধীরে চলুন
হেলমেট পরুন
WB 20AK 6405

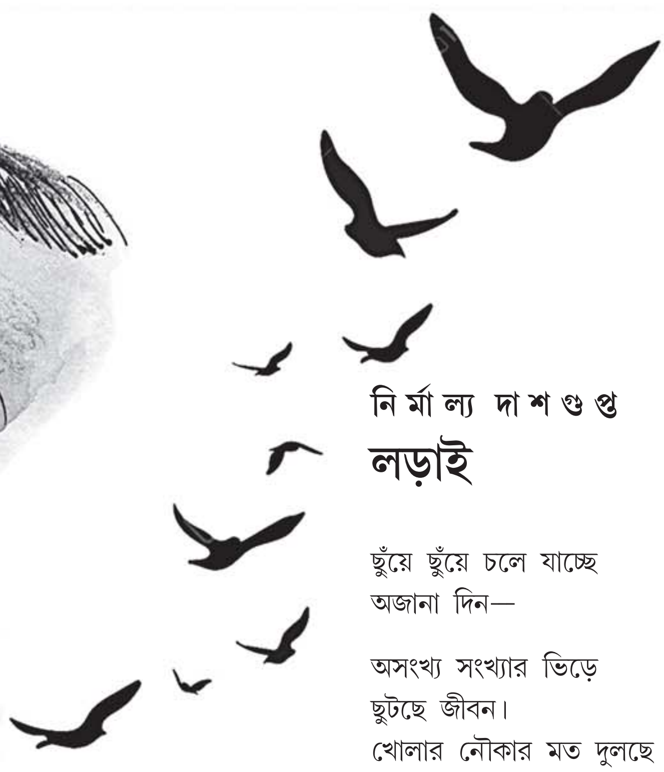

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

চোখের জল

দিনকাল বড়ো অন্যরকম
তুমিও যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারো
চোখের জল।

সন্দেহের ঊর্ধে কেউ নেই আজ,
যে তোমার ঘরের ডাক্তার
সে নিজেই অসুস্থ উপসর্গহীন।

যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ
যে কোনো মুহূর্তে সুপ্ত অগ্নিগিরি।

গলায় জড়ানো অজগর
সেও আজ ডায়েট কন্ট্রোল করে
ইচ্ছে-খিদে উপোসী রয়েছে
তোমাকে গিলবে বলে।

কেবল রক্ত নয়, থুথু নয়
তোমার চোখের জলও হতে পারে
বিপজ্জনক
কে জানে লুকিয়ে আছে কোন্ মারণ ভাইরাস
ভিতরে ভিতরে একটু একটু
চুরি করছে শ্বাস।

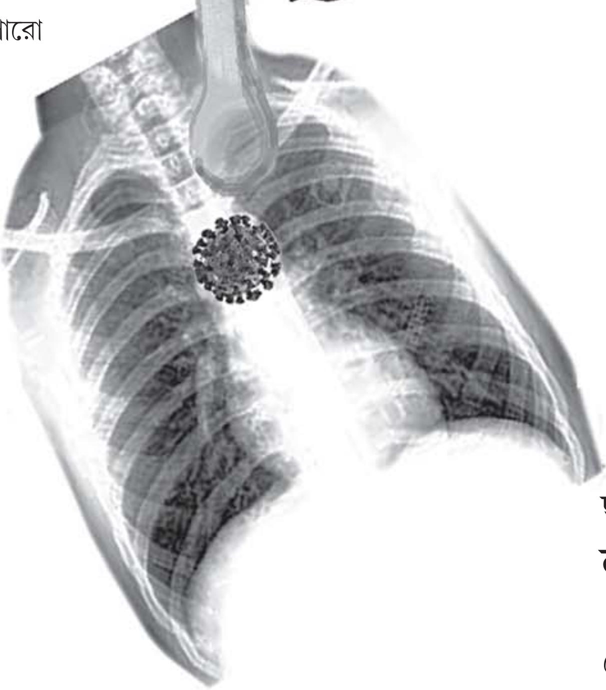

নি র্মা ল্য দা শ গু প্ত

লড়াই

ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে
অজানা দিন—

অসংখ্য সংখ্যার ভিড়ে
ছুটছে জীবন।
খোলার নৌকার মত দুলছে ভয়—
মুখোশের অন্তরালে
হেসে উঠছে আলো,
কালো সরিয়ে
মানুষের পায়ে পায়ে প্রণাম ছুটছে
বাঁচা না বাঁচার কথা নয়
লড়াইটাই জীবন—
ঘুরে দাঁড়িয়ে
ভালোবাসা হাসতে হাসতে
ছড়িয়ে পড়তে থাকে দুরন্ত বিশ্বে

ছ ন্দা শী ল ক র্ম কা র

লকডাউন

শেকড়ের মাটি ক্রমশ আলগা হতে থাকে
সবুজ পাতায় রূপ হলদে।

শেষ বাতাসের দৌড় থামবে এখুনি
নিস্তব্ধ রাস্তা, অন্ধ দোকান, জনহীন
তবুও নাড়ীর টান গলা ফাটায়;
কয়ি হ্যায়, অ্যাম্বুলেন্স বুলাও,
মুঝে হাসপাতাল যা না হ্যায়—

পা কাঁপে গলা শুকায়
নীল ওষ্ঠ কখন বরফ হয়।

শ্যামলকান্তি মজুমদার

দুঃখকে বেড় দিয়ে

একটা দুঃখকে বেড় দিয়ে আর একটা
ছায়ার পাশাপাশি আর একটা ছায়া, সাবলীল
কোথাও শরীর নেই, শরীরী সমগ্রতা, ছড়িয়ে
ছিটিয়ে কেবল একটা দুঃখকাতরতা, নামহীন
অপরিচয়ের বদান্যতা ঢেকে আছে বিস্ময়
অবাক নিস্পৃহ চাহনি, স্বভাব বেড় দিয়ে
ছমছম ঝিঁঝি ডাক, নিবিড় নিরলস কাতরতা
দেখতে দেখতে ভোর হচ্ছে, সকাল
সকাল পেরিয়ে...

কল্যাণ মিত্র

সেফটিপিন

চাঁদমারির গা ফুটো করে বেরিয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত তির
আজ এখানে কাল সেখানে ভাড়াবাড়ির উঁচু প্রাচীর

থাকলে আছি না থাকলে নেই, হালে কোথাও পাইনি পানি
দাগে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বীক্ষ্য রম্যানী।

লিখি যখন হুঁশ থাকে না মন মজে না কিছুতে
অন্ধকারের উড়োচিঠি জোনাকির মন খুঁতখুঁতে

পা ফেলব যে, সিঁড়ি কোথায়, ছাদে ওঠার এই কী ছিরি!
রং খেলছে, খুনখারাপি রং খেলবার পিচকিরি—

জল ডিঙোলে খন্দখানা, সোজাসাপটা যায় কী দিন!
লকডাউনে সজাগ আছি, খুলে ফেলিনি সেফটিপিন।

মন্দিরা ঘোষ

ভয়, পাখি এবং গাছ

ভয়ের উপসর্গ ধুয়ে ফেলতে
অকপট হচ্ছে হাত
আমাদের স্পর্শের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে জল
ঠান্ডা ঠোঁট বরফের মত সাদা হাত

ওঁৎ পেতে আছে অলক্ষ্যে ওরা
ভয়ে তোমার মুখ সাদা হয়ে ওঠা অবধি

সাবধানী তৎপর হবার পাঠ দেবে
পাখি এবং গাছ
শেখাবে কীভাবে সব কুৎসা সরিয়ে
উড়তে হয় আকাশে
কীভাবে ছোঁয়াচে ভান সারিয়ে
তুলতে হয় অন্তরঙ্গ ভুলে
কীভাবে মুখোশ খুলে মুখোমুখি হতে হয়
কীভাবে শ্বাসের ভেতর পুরে দিলে শ্বাস
বেজে ওঠে ভোরের সেতার

আর নিরলস ওড়ার পর শুধুমাত্র
গাছকেই বিশ্বাস করে
নেমে আসতে হয় মূলে

অ নু প হা ল দা র

লকডাউনে কেমন আছে নদীরা

মাত্র এই কদিনে অনেকটাই পাল্টে গেছে আমাদের পৃথিবী। দীর্ঘমেয়াদি লকডাউনে হু হু করে কমেছে দূষণের মাত্রা। চিন, ইতালি ও ব্রিটেনের আকাশেও অবিশ্বাস্য গতিতে কমেছে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও কার্বন-এর মাত্রা। শুধু ইউরোপ কেন বাংলার আকাশও এখন ঝকঝকে পরিষ্কার। দলবেঁধে ফিরে আসছে পরিযায়ী পাখিরা, যারা কার্যত বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া নিরীহ ডলফিন-এর দলও ফিরছে গঙ্গাবক্ষে। মানুষ আজ গৃহবন্দি হওয়ার কারণে যানবাহন কলকারখানা আজ বন্ধ। গাড়ি ও শিল্পের কালো ধোঁয়া যা প্রকৃতির বায়ুমন্ডলকে আচ্ছাদন করে থাকত আজ তার প্রভাবও ভীষণ কম। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম দূষণ সৃষ্টিকারী দুটি দেশ চিন ও আমেরিকার বায়ুর মানেরও উন্নতি ঘটেছে অনেকখানি।

আণুবীক্ষণিক একটি ভাইরাস—আর তাতেই ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। কার্যত গৃহবন্দি মানুষ, আর তাতেই প্রাণ ফিরে পাচ্ছে প্রকৃতি। বিগত আট বছরে নির্মল গঙ্গা প্রকল্পে ঢালা হয়েছে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাকে নির্মল করার জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। দীর্ঘমেয়াদী এই প্রকল্পে আদতে নদী কতখানি নির্মল হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বেও গঙ্গার জলের গুণগতমানের খুব একটা পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই লকডাউনে হারানো গৌরব অনেকটাই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের অন্যতম দূষিত নদীগুলির মধ্যে একটি হল গঙ্গা, সেই গঙ্গার জল এখন ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। বারানসীর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড: পি কে মিশ্রা বলেছেন গঙ্গা মূলত দূষিত হয় বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য মিশ্রিত জলের জন্য এখন কলকারখানা বন্ধ। তাই দূষণের পরিমাণ কমেছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। বেনারসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গঙ্গার ঘাট মানিকর্ণিকা ও রাজা হরিশচন্দ্র, যেখানে (দিন-রাত) সব সময় সারি সারি মৃতদেহের চিতা জ্বলতে থাকে। আর সেইসব ছাইপোড়া কাঠ, মৃতদেহের অবশিষ্ট ছাড়াও কয়েক হাজার কিলোগ্রাম ফুল বেলপাতা সহ পুজোসামগ্রী ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গায়। এছাড়াও শুধুমাত্র বেনারসেই আরো ৮৮টি এরকম ঘাট আছে। এছাড়াও এখানে গঙ্গার পাড়ে ছোট-বড় প্রায় দু-হাজার কারখানা থেকে বিষাক্ত ক্যাডমিয়াম কপার নিঃসৃত হয়ে সরাসরি গঙ্গায় মেশে। আছে ৩০টি বড় নর্দমা যা নাগরিক বর্জ্য বহন করে গঙ্গাতে ফেলে। এভাবে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ৩ কোটি লিটার তরল বর্জ্য গঙ্গাতে পড়ে। এখন তার পুরোটাই বন্ধ। এতো গেল শুধু বেনারসের ছবি। ২৫৫০ কি.মি. এই নদীর প্রতিটি বাঁকে, দুপাড় জুড়ে কত অজস্র শ্মশান, মন্দির ও নাগরিক বর্জ্যের নর্দমা যে মিশেছে গঙ্গাতে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আজ তার বর্জ্যের পরিমাণ অনেকটাই কমেছে।

স্বভাবতই সব নদী জুড়েই এখন একই ছবি। গঙ্গা দূষণের মাত্রা কমার সাথে সাথে কমেছে ভাগীরথীর দূষণও। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় অজয় ও ভাগীরথী নদীর সঙ্গমস্থলে এখন শুধু নীল জলরাশির খেলা, অজয়ের বুক থেকে এখন আর বালি চুরি যায় না। নীল জলে গেঁড়ি, গুগলি, বাংলার হারিয়ে যাওয়া পরিচিত মাছ, শামুক, শুশুক সবাই আজ নিরাপদে। নদীর এই রূপ শেষ কবে দেখেছিলেন কাটোয়াবাসী নিজেরাই মনে করতে পারছেন না। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে দামোদর নদ। দামোদর ও অজয়কে ঘিরে এই এলাকার মানুষের দিনযাপন। কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি সবেতেই জড়িয়ে আছে নদী দুটি। পরিবেশ ও কর্মীদের মতে গত কয়েক দশকে দামোদর-এর প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছিল ত্রিমুখী, প্রথমত অবাধে বালি তোলা ও বালি খাদানে ভারী যন্ত্রের ব্যবহার ফলে ক্রমশ বদলে যেতে শুরু করেছিল নদীর গতিপথ। নদী ক্রমশঃ তার গতিপথ ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে। এর জেরে গলসি, দক্ষিণ দামোদর এর মত এলাকায় ক্রমশ কমছিল নদী অববাহিকা, তলিয়ে যাচ্ছিল বিঘার পর বিঘা জমি। দ্বিতীয়ত সারা বছর নদীতে ঠিকমত জল না থাকা। তৃতীয়ত নদীর জল দূষণ, নদীর জলে শিল্পজাত রাসায়নিক মেশা নিয়ে বারবার আপত্তি তুলেছিলেন অনেকেই। বিষাক্ত এই জলের কারণে নদীর বাস্তুতন্ত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি খারাপ প্রভাব পড়েছিল। বর্তমানে নদীর বাস্তুতন্ত্র অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। IUCN (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার)-এর লাল তালিকায় থাকা বিপন্ন গাঙ্গেয় ডলফিন-এর সংখ্যাও বাড়ছে ভাগীরথীতে। নয়াচরে ডলফিন নিয়ে গবেষণা করা Nature Environment and Wildlife Society (NEWSE) এর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। এমনকি কলকাতার বিভিন্ন ঘাটেও অহরহ দেখা যাচ্ছে তাদের। সারা ভারতের সাথে আমরা বঙ্গবাসীরাও উপলব্ধি করতে পারছি বাংলার নদীর এই মনমুগ্ধকর রূপ। পরিসংখ্যান বলছে ভারতের কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমার সাথে সাথে কমেছে নদীদূষণের পরিমাণ, ফলে কিছুটা হলেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে নদীকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্রে।

একই ছবি দেখা যাচ্ছে উত্তরের নদীগুলির ক্ষেত্রেও, পরিযায়ী পাখিদের কলকাকলিতে ভরে যাচ্ছে উত্তরের নদীতটগুলি। যদিও এখন পরিযায়ী পাখিদের সমাগমের সময় নয়, তবুও এবছর দূষণ কমের কারণে গরমের প্রকোপ অনেকটাই কম, তাছাড়া নদীগুলি পরিশ্রুত হওয়ার কারণে মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বেশ কয়েকগুণ। ফলে পাখিদের এখনো দেখা যাচ্ছে উত্তরের নদীগুলিতে। যেমন তোর্সা, রায়ডাক, কালজানি প্রভৃতি নদীতে। ডুয়ার্সের ওদলা বাড়ি একটি উল্লেখযোগ্য বাজার। এখানে এর দুধারে দুটি নদী চেল ও ঘিস

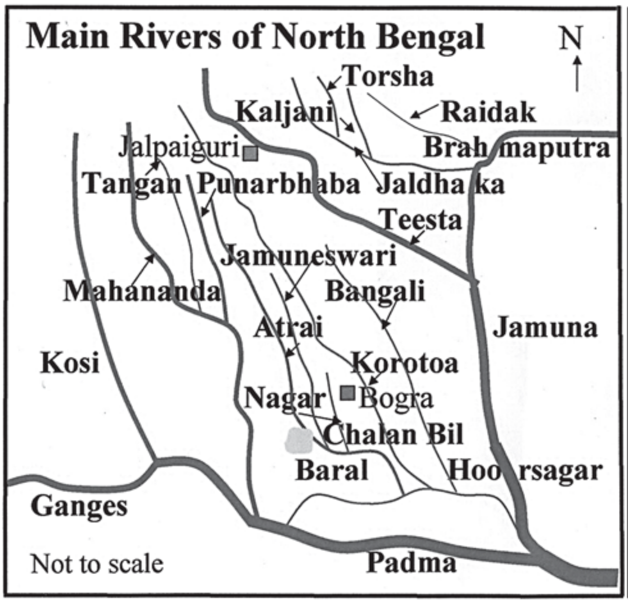

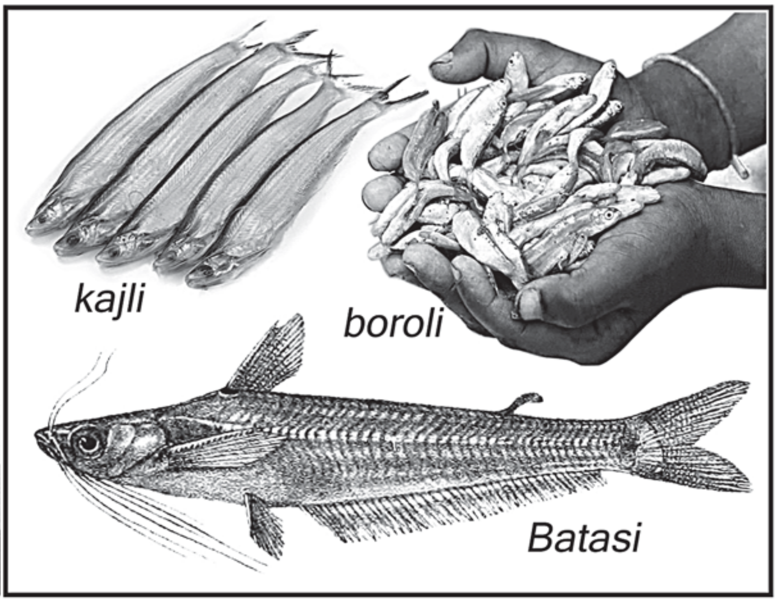

নদী দুটি থেকে বৈধ ও অবৈধ নানাভাবে দিনভর লক্ষাধিক ট্রাক হাজারের বেশি বালি খাদান থেকে বালি তোলা হত। তার সাথে নদীর বুকে রাখা বিরাট পাথর ভাঙ্গা ক্রাশার মেশিন-এ ভাঙ্গা হত পাথর। এখন সবই বন্ধ, যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে নদী দুটি। ডুয়ার্সের আবহাওয়া এখন অনেকটাই অতীতের স্মৃতিকে ফেরাতে শুরু করেছে। দিনে তাপমাত্রা বেশি থাকলেও বিকালের পর অঝর ধারায় বৃষ্টি, ঠিক যেন ৪০ বা ৫০ বছর আগেকার ডুয়ার্স। উত্তরের আর এক অহংকার বোরোলি মাছ। কয়েক দশক আগেও যেখানে এক কুইন্টাল-এর উপরে বোরোলি ধরা পড়ত, এখন তা কমে ২০/৩০ কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তাও আবার অনিয়মিত। বোরোলি রক্ষায় একাধিকবার সচেতনতা কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য মৎস্য দপ্তর। তাতে কাজ তেমন কিছুই হয়নি। তবে বর্তমানে মাছের চাহিদা কম থাকায় এবং নদী দূষণের মাত্রা কম থাকায় বোরোলির সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তোর্সা, কালজানি, গদাধর, রায়ডাক নদীতে শুধু বোরোলিই নয় পাবদা, শিলং, বাতাসি, বাঘারি, কাজলি, খাটা, সোনালি আড়, সরপুঁটি, কুরমা, বালু চাটা প্রভৃতি মাছের সংখ্যাও বেড়েছে ভীষণভাবে।

এবার আসা যাক দক্ষিণ দিকে। বিদ্যাধরী দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে দূষিত নদীগুলির মধ্যে একটি। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ১৫৩৯.২৪ মিলিয়ন লিটার তরল বর্জ্য ফেলা হয় নদীটিতে। ১২টি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজ করে প্রতিনিয়ত, যার শোধন ক্ষমতা ১২৭৬.৭৩ মিলিয়ন লিটার। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ খরচের পরেও বিদ্যাধরীর দূষণে জেরবার ছিলেন হাড়োয়া, মিনাখাঁ ব্লকের চাষি ও মৎস্যজীবীরা। বর্তমানে এই লকডাউনের সৌজন্যে দূষণ প্রায় অর্ধেকেরও কম, যার সুফল পাচ্ছেন সকলেই। সুন্দরবনের অন্যান্য নদীগুলির ক্ষেত্রেও দূষণ এখন অনেকটাই কম। সুন্দরবনের অন্যান্য নদীগুলি দূষিত হয় মূলত নদীর পাড়ে গজিয়ে ওঠা প্রচুর ছোট-বড় কারখানা, বিশেষত পোশাক রং করার কারখানা, ব্যাটারি তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সহ আরও বেশ কিছু কারখানা। এর ক্ষতিকারক রাসায়নিক বর্জ্য সরাসরি এসে মেশে নদীগুলিতে। তাছাড়াও সারা বছর নদীতে মাত্রাতিরিক্ত লঞ্চ ও ভুটভুটি চলার ফলে নদীর জলের উপরিভাগে তেলের আস্তরণ জমে যায়। সাথে বিকট শব্দে জলজ প্রাণীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এছাড়াও পর্যটকদের বাড়বাড়ন্তও নদী তথা সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের উপর একটি দীর্ঘমেয়াদী খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। এখন সবই বন্ধ। ফলে ইছামতী, রায়মঙ্গল, বিদ্যাধরীর এমন টলটলে স্বচ্ছ জল শেষ কবে দেখা গেছিল তা মনে করতে পারছেন না অনেকেই। সুন্দরবন তথা নদীর জীববৈচিত্র্যে এখন কিছুটা স্বাভাবিক ছন্দেফেরার চেষ্টা করছে। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা ফিরছে, নদীতে মাছ ও মিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হল নদীর বর্তমান এই উন্নতি সাময়িক, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আবার সেই আগের পরিস্থিতিতেই ফিরে আসবে প্রকৃতি। তাহলে কিভাবে নদীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে? এর উত্তর আছে নীতিনির্ধারকদের হাতে আর কিছুটা আমাদের মতন সাধারণ জনগণের কাছে। সরকারকে বুঝতে হবে নদীতে বড় বাঁধ দিয়ে কখনোই তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। নদীকে অবিরল ধারায় বইতে দিতে হবে। বড় বাঁধ শুধুমাত্র নদীরই বিপদ ডেকে আনে না, সভ্যতারও বিপদ ডেকে আনে। কলকারখানা দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলি কখনোই তার শিল্পবর্জ্য পরিশ্রুত না করে নদীতে ফেলতে পারবে না তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। নদীর সংযুক্তি করে কখনোই তাদের জলস্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, এই বিপজ্জনক ভাবনা থেকে সরকারকে পিছু হটে, বিকল্প ভাবনা ভাবতে হবে। গঙ্গাকে শুধুমাত্র জাতীয় নদীর তকমা দিলেই নদী পরিশ্রুত হবে না। তার জন্য স্থায়ী পরিকল্পনার প্রয়োজন। দেশের ছোট-বড় প্রত্যেকটি নদীই সভ্যতার বড় সম্পদ। এই ভাবনা সবাইকেই ভাবতে হবে। সাথে আমাদেরকেই মাথায় রাখতে হবে নদী শুধুমাত্র জীবিকার কাঁচামাল বা শুধুমাত্র আমাদের ভোগ্য বস্তু নয়। বাস্তুতন্ত্রের সকল প্রাণীরও নদীর উপর সমান অধিকার আছে। তবেই নির্মল হবে সব নদী।

email:anuphalderkly@gmail.com • M. 9143264159

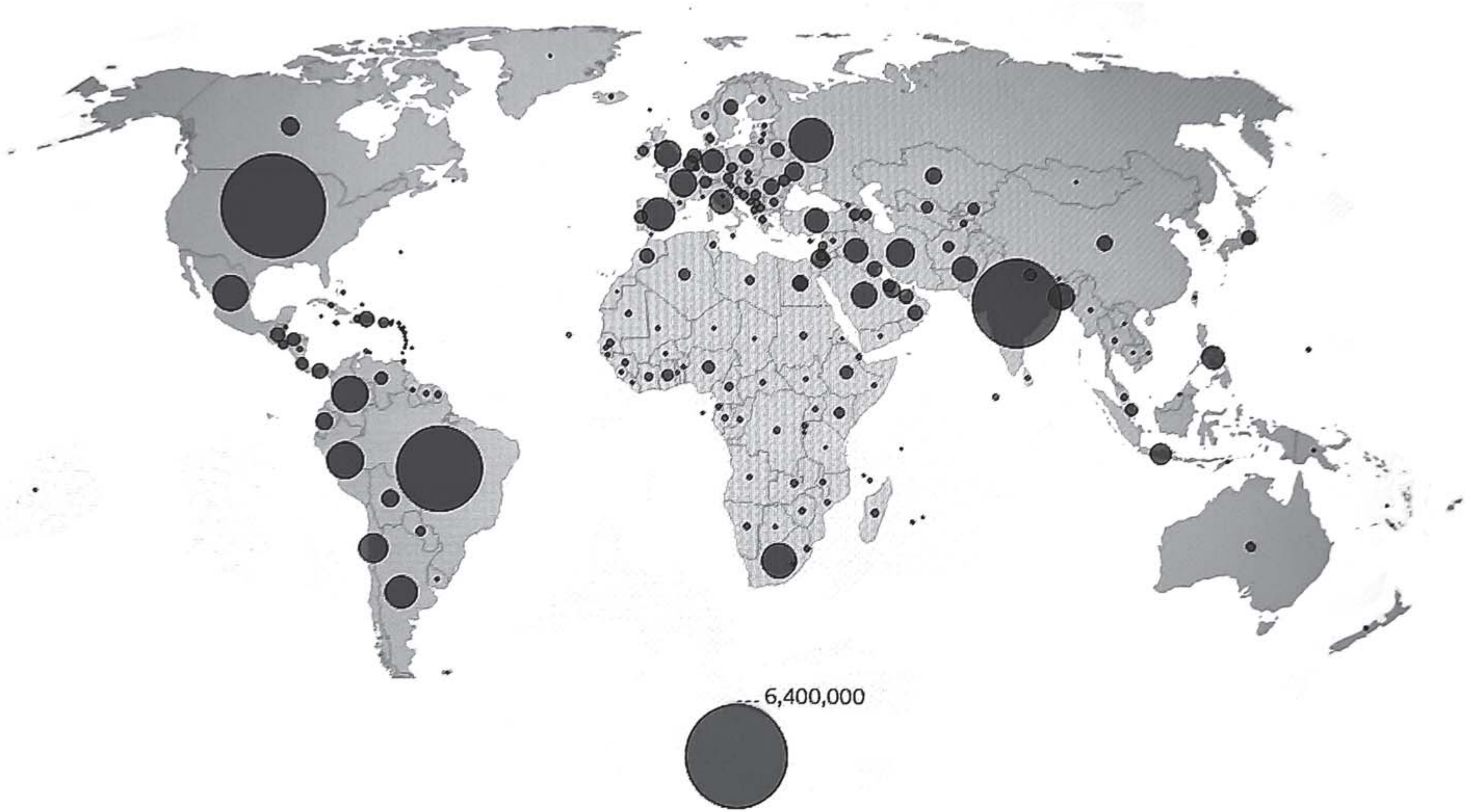

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মানচিত্র (১২ সেপ্টেম্বর ২০২০)
উপরে বৃত্তগুলি দেখাচ্ছে দেশে দেশে নিশ্চিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিমাণ ও অঞ্চল
সবচেয়ে বড় বৃত্তের অঞ্চলে মোট প্রায় ৬৪ লক্ষ করোনা আক্রান্ত
পৃথিবীতে মোট সংক্রমণ : ২,৮৪,৬৭,১৮৩; মৃত্যু : ৯,১৫,৮৯৩ ● সূত্র : জন্‌স হপ্‌কিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়

With best compliments :

Admission going on

Nursery to Class X

KANCHRAPARA

Albatross School

127, K.G.R. Path, Kanchrapara
Mob: 8013191616, Dial: 033-25856660
Website: www.albatrossschool.com
E.mail: info@albatrossschool.com

BIGYAN ANNESWAK VOL : 17 Issue No. 3 & 4 May-Aug 2020 RNI. WBBEN/2003/11192 ISSN 2582-5674

ভাবনায় করোনা